বিপ্লবের পথে

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

বাসন্তী লাইব্রেরী
২২/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
অনিলকুমার ভৌমিক
বাসন্তী লাইব্রেরী
২২/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ :
মার্চ ১৯৮২

প্রচ্ছদ : চারু খান

মুদ্রাকর :
প্রশান্তকুমার বসু
ডি. পি. প্রিণ্টার্স
৫২/১, সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

সেটা ছিলো পথ তৈরীর যুগ। যারা পথ তৈরী করতে এলো তারা অবিশ্বাস, উপেক্ষা, বিরোধিতা, দেশবাসীর উদাসীনতা, সব তুচ্ছ করে স্বাধীনতার শিখরে পৌঁছবার জন্যে পথ রচনা করতে লেগে গেলো। বড়ো কঠিন ছিলো সেই সাধনা। প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কোনো অবস্থাতেই সহজ নয়, আর দেশের তখনকার অবস্থাতে সেটির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেরই বিশ্বাস ছিলো। এমন অবস্থায় যারা এগিয়ে এলো তারা দুঃসাধ্যব্রতী নিষ্কাম আদর্শবাদী। তাদের অন্তরের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মানব-প্রেমের অনির্বাণ দীপ-শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও আরো বহু মননশীল সাধকেরা।

আত্ম-অবিশ্বাসী জাতির মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা ও পরম আত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্যে শতাব্দীব্যাপী সাধনা করে গিয়েছিলেন এই অনন্যসাধারণ পুরুষেরা। জাতির ও ব্যক্তির জীবনের এমন কোনো সমস্যা ছিলো না যার উপরে তাঁদের প্রদীপ্ত মনের আলো পড়ে নি, যার সমাধান তাঁরা যোগান নি।

জাতির চিত্ত-ভূমিতে যখন পলি পড়লো তখন জাতির চিত্তের বন্ধ্যাত্ব ঘুচ্‌লো আর জাতির চেতনা-দীপ্ত মন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বপ্রকার মুক্তির দিকে যাত্রা সুরু করে দিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার যাত্রা এই অমিতবীর্যশালী পুরুষেরাই সুরু করিয়ে দিলেন।

সেই পথ তৈরীর যুগের তৃতীয় পর্বের ছবি এঁকেছেন শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর 'বিপ্লবের পথে' বইটিতে। এই যুগের বহু তথ্য যা শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মীদের জানা ছিল, অজানা ছিল দেশবাসীদের, সেগুলি গ্রন্থকার আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। কিন্তু বইটি শুধু তথ্যের তালিকা নয়, আর বর্তমান কালের আত্মজীবনী লেখকদের যেটি বিশেষত্ব আত্ম-বিজ্ঞপ্তি, সেই রুচিহীন বিশেষত্বের কালিমা চিহ্নিত নয়।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত হাসতে জানেন ও নিজেকে বিদ্রূপ করবার তাগদ রাখেন। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে কারাগারের অকরুণ ধূসর অবস্থাতেও হাসির অভাব, রসের দৈন্য কখনও অনুভব করিনি তাঁর আলাপ আলোচনায়।

যার রস-জ্ঞান নেই সে মানুষ ভয়ঙ্কর, তাকে ভয় করে সাত হাত দূর থেকে চলা ভাল। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের মানবতাবোধ ও রস-জ্ঞানের পরিচয় 'বিপ্লবের পথে' বইটিতে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। বইয়ের সবটাই সমান বুনুনির সাক্ষী দেয় না, কিন্তু গোটা বইটাতেই বুনুনির মুন্সিয়ানার দাবী ক'জন লেখকই বা করতে পারেন। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে 'বিপ্লবের পথে' হচ্ছে লেখকের সর্বপ্রথম প্রয়াস সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

১৮ই পৌষ, ১৩৬৪ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের 'বিপ্লবের পথে' তার বিপ্লবী-জীবনের কাহিনীই শুধু নহে, বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের একটা বলিষ্ঠ অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর চিত্র। যাঁহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশী শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের কর্মপ্রয়াস ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ও কর্মপ্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ অনেকটা সহজ-সাধ্য হয়। সেদিক হইতেও এই 'বিপ্লবের পথে' গ্রন্থের মূল্য আছে। শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করি, যেমন করি আরও বাংলার ও ভারতের বিপ্লব-কর্মীদের, যাঁহাদের বিপ্লবের আদর্শনিষ্ঠা বরাবর অম্লান রহিয়াছে। এই ধরনের বিপ্লব-নিষ্ঠ কর্মীগণ কি বাহিরে, কি কারাভ্যন্তরে, সকল সময়েই অদম্য ও অনির্বাণ সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সংগ্রাম-নিষ্ঠ বিপ্লবী লেখকের 'বিপ্লবের পথে' পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এই দুর্গম পথ-যাত্রীদের যে পাথেয় সঞ্চয় ছিল তাহা আপোষ-হীন আদর্শ-নিষ্ঠার দুশ্চর তপস্যার দ্বারাই শুধু সম্ভব হইয়াছিল।

২৮শে অগ্রহায়ণ
১৩৬৪

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

লেখকের কথা

আমার এই লেখ আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনী লিখবার সঙ্কল্প আমার নেই। সৈনিকের ডায়েরীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রেখেছিলাম। কালের গতিপথে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে লেখনীতে আবদ্ধ করে রাখার ইচ্ছা হল। তারই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্বাধীনতার ইতিহাসে আমার অবদান নগণ্য—সামান্য একটি সৈনিকের মতন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অগুনতি বালুকণা যেমন, স্বাধীনতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমার অবদানও তেমনি। তবুও তার মূল্য আছে—স্বাধীনতার ইতিহাস প্রযোজনায়। সভ্যতার ইতিহাসে পিছে হাঁটার ও আগে বাড়ার নজির আছে—এভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ভারতের সভ্যতা এগিয়ে নেবার জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রাঙ্গণে বহু আদর্শ-নিষ্ঠ ও মননশীল ব্যক্তিরা জন্ম নিলেন। তাঁরাই ভারতকে জাগিয়ে তুললেন। সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য মন্ত্রগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেলেন অমর আদর্শ, তাঁর চির-ভাস্বর লেখনিতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গানে, গাথায়, কবিতায়, সাহিত্যে ভারতকে বেঁধে দিলেন সুনিবিড় ঐক্য বন্ধনে—অতীত ও বর্তমান এক হয়ে দেখা দিল। জাতির প্রস্তুতি ঘোষণা করলেন ক্ষুদীরাম ও কানাইলাল নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে। বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হল, পি. মিত্র, বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে। "সন্ধ্যা", 'যুগান্তর" তাদের অগ্নি-গর্ভ বাণী নিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলল অপূর্ব প্রেরণা ও আত্মত্যাগে।

তাঁদের আদর্শ বহন করে চলল বাংলার বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলো—অনুশীলন, যুগান্তর ও পরবর্তী কালের বি. ভি শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি। তাঁদেরই হাতে গড়া মানুষ আমরা, বঙ্কিমের "সন্তান"। শোষিত নিপীড়িত ভারতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাবার আদর্শ তখনও জনমনে আত্মপ্রকাশ করেনি। জাতির এই অর্ধচেতনার যুগে স্বাধীনতার উচ্চাদর্শের দুর্গম পথ বেছে নিল, সন্তানের দল। স্বাধীনতার জয়যাত্রার ইতিহাস সূচিত হল। গ্রেফতার, কারাবরণ, দ্বীপান্তর, ফাঁসি বা গুলিতে হত্যা বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখা দিল। বাংলার আন্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঘটনাবলীর সুযোগে ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ, নগেন দত্ত (গিরিজা দত্ত), শচীন্দ্র সান্যাল, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, গুরুমুখ সিং, কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতির নেতৃত্বে, তাতে প্রকাশ পেল বিপ্লবীদের জাতীয় নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার আদর্শের উপর তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁদের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর একদিকে বৈপ্লবিক দলের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও সভ্যদের এবং অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীর সিপাহী ও অফিসারদের গ্রেফতার, নির্বাসন, কারাদণ্ড ও ফাঁসি বা গুলিতে হত্যাপর্ব অনিবার্যরূপে শুরু হল। ব্যর্থতার গ্লানি ও পরাজয়ের মধ্যেও বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি স্বাধীনতার দুশ্চর তপস্যা থেকে বিরত হল না। অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সম্মুখীন হবার জন্য তারা আবার নতুন করে তৈরি হতে লাগল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটল, ১৯২০ সালের পর থেকে। আবেদন, নিবেদনের পালা শেষ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী কংগ্রেস জানাল—পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তখনও বহু দূরে। শাসক ইংরেজ "সূচ্যগ্র-মেদিনী"ও ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসনমূলক দাবীর সঙ্গে তাল রেখে বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে পা মিলাল, তাকে এগিয়ে নেবার জন্য। গোপন ও অর্ধগোপন বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি সারা বাংলায় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিল—আদর্শ-নিষ্ঠ ও ত্যাগব্রতী বিপ্লবী সমাজের সহযোগিতায় ও পরিচালনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই গড়ে উঠল।

বিপ্লবীরা স্বাধীনতার আদর্শে পৌঁছাবার চিরাচরিত ঐতিহাসিক পন্থা ত্যাগ করল না—অহিংস আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা রেখে বৈপ্লবিক পন্থাও তারা অনুসরণ করে চলল। তাই তাদের গ্রেপ্তার, কারাবরণ, দ্বীপান্তর বা ফাঁসির বহরও কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও কারাবরণের সঙ্গে বাহিরেও চলতে শুরু করল। সুদীর্ঘ কাল ধরে স্বাধীনতার পথ এভাবে তৈরি করেছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের ত্যাগ বীরত্ব ও আদর্শ-নিষ্ঠা গণ-চেতনা ও গণ-জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল; তাঁরা ছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতারূপ আদর্শের অকৃত্রিম পূজারী ও জাতির প্রধান প্রাণশক্তি।

১৯২৯ সালে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ

করেছিল সত্যি কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার দাবী রাজশক্তিকে দিয়ে তারা মানাতে সক্ষম হয়নি। বিপ্লবীরা নির্বাসন কারাদণ্ড বা জীবন আহুতি দিয়ে তাদের আদর্শে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে ইংরেজ রাজশক্তির ও সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজের আঘাত, ভারতব্যাপী বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ভারতে স্বাধীনতার পথ ও দাবীকে প্রশস্ত করেছিল। ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অধিকতর সহানুভূতির সহিত ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও সংগ্রাম অভ্যন্তরীণ সামরিক বিদ্রোহ এবং বাহির হতে ইংরেজ কর্তৃক সামরিক আঘাত ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত বাস্তব করে তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত অবিমিশ্র আশীর্বাদরূপে এল না। ভারত ভাগ হয়ে গেল। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইংরাজ রাজশক্তি ভারত ত্যাগ করল।

ইতিহাসের অগ্রগতির মুখে অতীত কালের ঘটনা ও কার্যপরম্পরা এনে দিয়েছে বর্তমানের স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতার বুনানীতে, তার রক্ষণ ও বিস্তারে, বর্তমানে অতীতের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কম নয়। জাতির এই কাল-ব্যাপী সাধনার বেদীতে নগণ্য অবদানও ভুলে যাবার নয়। যাঁরা এই বেদী গড়ে তুলেছিলেন, সেই বেদীর পাদপীঠে আমার ভক্তি অর্ঘ্যখানি অর্পণ করলাম।

আমার লেখার মধ্যে ভাষার ভুল ক্রটি অনেক আছে। বাগ্দেবীর সাধনা হ'তে দূরে কাটিয়েছি বহুদিন। রণক্ষেত্রের সৈনিক হিসবে অতন্দ্র পাহারায় সবাইর মতো নিযুক্ত ছিলাম, তাই ভাষার ভুলক্রটি অনেক জায়গায়ই থাকবার কথা। পাঠকের নিকট নিবেদন তাঁরা যেন ভুলক্রটিগুলোকে বড় করে না দেখেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, আমার যে সব বন্ধুরা বইখানাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন নানাভাবে, তাদের ঋণ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং একথা সত্যি যে তাঁদের সাহায্য না পেলে বইখানা প্রকাশ করতে সমর্থ হতাম না। 'বিপ্লবী বাঙালী' সাপ্তাহিক কাগজখানা আমার লেখা ছাপিয়ে রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন তাহাও আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

১২ই মাঘ, ১৩৬৪
(২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৮)

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের কথা

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ঘটনা সংযোজনের উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে চতুর্থ দশকের শেষ পাদ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ক্ষুদ্র অংশ "বিপ্লবের পথে"র বইতে ইংরাজী ১৯৫৮ সালে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তারপর এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যে নৈতিক মানদণ্ডের ও আদর্শের অভাব ঘটেছে, তা লক্ষ্য করে বইখানির পুনর্মুদ্রণের আবশ্যকতা একান্তভাবে বোধ করেছি। কারণ পরাধীন ভারত তার দুর্জয় সঙ্কল্প, সাধনা, আত্মত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়ে যে জাতীয় ঐক্য, নৈতিক মানদণ্ড ও শক্তি অর্জন করেছিল তার প্রতিচ্ছবি বইতে প্রতিফলিত হয়েছে। একদা এই জাতীয় শক্তিই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের মূল ভিত্তি ছিল।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী এবং রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে ভারতের সর্বত্র অবাধ দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা বাদ, গোষ্ঠীতন্ত্রের দৌরাত্ম্য প্রভৃতির ফলে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্য বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতেছে। এর ফলস্বরূপ জাতি দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং আত্মবিশ্বাস হারাতে বসেছে। সম্বিত ফিরে পাবার জন্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামমুখী অতীতের তথ্যাদিসমূহ তুলে ধরলে বা প্রচারিত হলে জাতির নৈতিক জাগরণ সম্ভব হবে, আত্মশক্তি ফিরে পাবে। অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও এ আশা ও বিশ্বাস পোষণ করি।

"বিপ্লবের পথে" বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ উক্ত উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংশোধনসহ প্রকাশ করা হল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর আমার পরম স্নেহভাজন "বাসন্তী লাইব্রেরী" শ্রীমান অনিল কুমার ভৌমিক বইটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে। এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই সে এ কাজে অগ্রণী হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কামনা করি তার উদ্দেশ্য সফল হউক।

১লা চৈত্র, ১৩৮৮ — পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

(১৫ই মার্চ, ১৯৮২)

'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।'

—রবীন্দ্রনাথ

বিপ্লবের পথে

শুদ্ধিপত্র

২৮ পৃষ্ঠার ১৮ পঙ্‌ক্তিতে "কিছুদিন পরে"-এর পরিবর্তে "কিছুদিন পূর্বে" হবে।

এক

ঢাকা শহর থেকে দূরে—পল্লী মায়ের শ্যামাঞ্চলে কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। অভিজাত বংশে জন্মের অহমিকা বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ভাগ্য সেখানে দারিদ্র্যের সত্য কঠিন স্পর্শে গর্বকে চূর্ণ করেছে। মামাদের আশ্রয়ে থেকেই লেখাপড়া শিখি। অসীম স্নেহ তাঁদের কাছে পেয়েছি। সবচেয়ে দামী যে জিনিস পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে—তা করুণা নয়, মর্যাদা।

গ্রামের স্কুলে পড়ি,—সমৃদ্ধ শ্রী সম্পন্ন গ্রাম। সহপাঠীদের পোশাকে পরিচ্ছদে তার ছাপ ছিল। আমার নিজের জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিতুম, পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি ব্যাহত হত না ধোপদুরস্ত পরিচ্ছদের অভাবে। বাড়ির দৈনন্দিন হাটবাজার করতাম, গয়লা বাড়ি থেকে দুধ বয়ে নিয়ে আসতাম, আমার রোজকার কাজের তালিকায় এগুলো অপরিহার্য ছিল, কোনদিনই এগুলোকে অবাঞ্ছিত ছোট কাজ বলে মনে করিনি। এতে লাভ করেছিলাম একটা সহজ জীবন ধারা ও স্বাবলম্বনের অভ্যাস। তা ছাড়া এসব কাজ করে মনে পেতুম সহজ আনন্দ। দারিদ্র্য তাই কোনদিনই তার গ্লানির বোঝার ভারে আমার জীবনকে নুইয়ে দেয়নি—দেয়নি নিচুতে নামিয়ে। পড়াশুনায় আমার আগ্রহ ও সাফল্য আমার জন্য এনেছে সহপাঠীদের সাহচর্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয় হিসাবে আমি দারিদ্র্যের মারফৎ পেয়েছি স্বাবলম্বন ও শ্রমের অভ্যাস।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঙ্গে প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর আমার মধ্যে। প্রখর মননশক্তি প্রেরণা যুগিয়েছে দেশপ্রেমের। কিশোর বয়সের ধ্যানমূর্তিতে বিরাট দেশের ছবি কতটাই আর ফুটত। গ্রামের আম-কাঁঠালের বন,—পল্লী-পথের মাঝে মাঝে বটঅশ্বত্থের ঘন ছায়া,—চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দিত। ঐ বাঁশ বনের ধারে, তালপুকুরের ওপারে

আঁকাবাঁকা মেঠো পথের দুধারে চাষীদের বাড়ি—কোথাও ধোপাপাড়া, কোথাও মৎস্যজীবী ও বারুইদের রকমারি গৃহগুলি, কোথাও বা ঘন বসতি কোথাও বা বিরল বসতি—এক অগোছালো বৈচিত্র্যে গ্রামখানি ছবির মতো দেখাত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার স্নেহ পরিচয়ের মাধুর্য অন্তরকে স্পর্শ করত সহজে। সবার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের টুকরো খবর ঐ বয়সে যতটুকু পেতাম তাতে অন্তরে কখনও জাগত আনন্দের অনুভূতি,—কখনও বা সমবেদনায় ভেতরটা নরম হয়ে উঠত, কখনও বা প্রতিকারের জন্য প্রাণ হত চঞ্চল। গ্রামের দীঘির পারে আমাদের খেলাধূলো হুটোপাটি চলেছে, দীঘির কালো জলে মাছরাঙা এক একবার ঝাপটা দিয়ে জল ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনতিদূরে দিগন্তব্যাপী পাটের বা ধানের ক্ষেত ; হাওয়ার সাথে অগুন্তি ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতুম মুগ্ধ চোখে, কবির গানের কলি নিজের অলক্ষ্যে কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা"। সহজ ধ্যানেভরা দৃষ্টিতে ফুটে উঠত দেশের অস্পষ্ট ছবি। গাছপালা, স্থাবর-জঙ্গম, পাহাড়-পর্বত, রকমারি পশুপক্ষী আর কত মানুষের ভিড়। সবই যেন একান্ত আপন—একান্ত নিজস্ব।

গ্রামের পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনের দায়িত্ব আমার উপরে এসে পড়েছিল। সানন্দে ও সাগ্রহে সে দায়িত্ব বহন করেছি। লাইব্রেরীতে আহৃত গ্রন্থের ভিতর দিয়ে দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীজনের কর্মকীর্তির সঙ্গে ঘটল নিবিড় পরিচয়। তাঁদের চিন্তা ও প্রেরণা জীবনকে ভাবময় করে তুলল। নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে" আম্রবনের তূর্যধ্বনি "কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল"—যে ধ্বনি দিগন্তে তুলেছিল তার সুরলহরী আমার প্রাণকে দুলিয়ে দিয়ে গেছে। হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান-গাথায় মর্মের মালঞ্চে মুকুলিত হয়েছে কত নব নব আশার কুসুম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মনের গভীর গহনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দাবি করেছে দেশজননীর জন্য সর্বস্বপণের সংকল্প, 'নীলদর্পণ' পড়তে পড়তে পেশীগুলো এক এক সময় নিজের অগোচরে দৃঢ় হয়ে

হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। এক এক সময় দেখেছি বাস্তবের কঠিন আঘাতে গ্রামের শান্ত সুনিবিড় ভাবটি আচমকা ভেঙ্গে গেছে। গ্রামের জহিরুদ্দি আর খরুশেখ দলবল সহ পাট ও ধানের ভাগ নিয়ে লড়াইয়ে মেতেছে। লাঠি-বল্লমে সজ্জিত সংগ্রামিকেরা। চকিতে থেমে গিয়ে পথ করে দিয়েছে আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদের। এতটা হানাহানির মধ্যেও বিবেক ও বিচারবুদ্ধি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শুধু বাংলার শিক্ষিত মনকেই নাড়া দেয়নি, গ্রামের চাষী মজুরের প্রাণকেও তা দোলা দিয়ে গেছে। এরাও সুর করে গাইতো, "ছিল ধান গোলাভরা—শ্বেত ইন্দুরে করল সারা"—ক্ষুদিরামের ফাঁসীকে উপলক্ষ্য করে অশিক্ষিত চাষীর কণ্ঠেও জাগত ভাটিয়ালী সুর "এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। এক এক সময় আনমনা হয়ে যেতাম এ গান শুনে,—কখনও বা তন্ময় হয়ে থাকতাম। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা বাংলার কুটিরে প্রবেশ করেছে ঝড়ের বেগ নিয়ে; মধ্যবিত্ত সমাজের কচি কিশোর প্রাণে দিয়ে গেছে প্রলয়-দোলা, শাসকদের উদ্দেশ্যে কচি হাতের তর্জনী—অলক্ষ্যে শূন্যে উঠেছে—কণ্ঠে জেগেছে রুদ্রবীণা—"সাবধান সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান"। এক কথায় বলা যায় বাঙালী তরুণের কণ্ঠে ছিল বজ্র, চোখে বিদ্যুৎ-শিখা। স্কুলের বাঁধা রুটিনের বাইরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থরাজীর মধ্যে পেয়েছি দেশপ্রেমের প্রেরণা। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী জীবনে জাগিয়েছে অভূতপূর্ব উন্মাদনা—পরবর্তী জীবনে দিয়েছে অভয় মন্ত্র।

Digbyর **"Prosporous India** (সমৃদ্ধ ভারত) পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতাম প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির বিপুল সমারোহের মধ্যে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে দেখতাম শোষিত, সর্ববিভবে বঞ্চিত, দরিদ্র ভারতবর্ষকে। ব্যথায় যখন ম্রিয়মান হয়ে পড়তাম তখন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠ কানে আসত—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"।

সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পাঠ করতাম। পাঠ্য পুস্তকের পরিধির

বাইরে বিরাট জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে হয়ে গিয়েছিল একটা নাড়ীর যোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা তখন সজোরে বাজছে। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকেও সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে—ইংরেজের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংরেজের শত্রুর জীবন হনন করতে ও নিজের জীবন দিতে। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় যুবক উৎসাহ ভরে যুদ্ধে চলেছে। ভারী বিসদৃশ ঠেকত ধর্ষিত ভারতবর্ষের এই মনোবৃত্তি। শুধু অর্থের বিনিময়ে যারা পরের জন্য প্রাণ দিচ্ছে তারা তো ভীরু নয়, প্রাণ তো দিচ্ছে? কেন নিজের দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য এগিয়ে আসে না? ইংরেজ এ যুদ্ধে জিতলে ভারতের কি লাভ? ইংরাজের সুসময়ে কী তাদের প্রত্যাশা—কী তাদের আকাঙ্ক্ষা?

দুই

ছোটবেলা থেকেই পড়তে ভালো লাগত ইতিহাস। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেড়াতাম ভারতের কথা; ভারত আমার দেশজননী, আমি তার সন্তান এই গৌরববোধ সামান্য ছিল না—আপন মনে সুর করে কতদিন আবৃত্তি করতাম—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"। অন্য জাতির ইতিহাসের পাতায় তাদের কত উত্থান পতনের কাহিনী পড়তাম। ভারতের অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সে কাহিনী মিলিয়ে দেখতাম, কখনও বক্ষ গর্বে স্ফীত হত কখনও বা হত বেদনায় কাতর।

ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেও সন্ধান করতুম দেশমাতৃকার সত্যিকার রূপ। পড়েছি ভারত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে অতুলনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিবরণ,—শেষ অধ্যায়ে দেখলাম সহস্র গ্লানিতে ভরা নিঃস্ব এক ভূখণ্ড। বুঝতে কষ্ট হয়নি বিদেশী আক্রমণের বন্যার ফলে ধুয়ে গেছে এ দেশের ধবলগিরি,—এ পারের সোনার তাল মহাসাগর

পেরিয়ে গিয়ে জমা হয়েছে ওপারে স্বর্ণলংকার রাজধানী লণ্ডন শহরে। ওপারে আলোর ঝর্ণাধারা—এ পারে নিরন্ধ্র অন্ধকার,—ঝিমিয়ে পড়া দেশ—ঘুমিয়ে পড়া মানুষ।

ম্যাট্রিক পাস করে এসেছি ঢাকা শহরে। কলেজে পড়ছি। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার আধজাগা অন্তরে ঘটাল নতুন চেতনার অরুণোদয়। এতকাল মনের গহনে এক ভাষাহীন, সুরহীন মূর্তিমান অন্ধ আবেগ গুমরে মরছিল। পথের দিশারী হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস গণচেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাণবন্ত প্রকাশ ছবির মতো মানসচক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপরে যেন দেখলুম এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উদ্ধত রাজমুকুট হল ধূলিসাৎ। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ভগ্ন দেউলে রক্তের লেখায় ফুটে উঠেছে অগ্রগতির অমোঘ নির্দেশ। পরাধীন ভারতের মুক্তিপথের ইঙ্গিতও যেন শোণিতাক্ষরে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় লেখা দেখলাম। Abbot-এর লেখা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে পেলাম দুনিয়াজয়ী ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ। যে সব ইংরাজ লেখক, বক্তা, স্বাধীনতার পূজারী সে দিনে মানুষের খ্যাতি ও বন্দনা লাভ করেছেন—তাঁদের লেখাগুলো শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করতাম—আয়ত্ত করতাম। বার্ক ও ফক্সের লেখা আজও জীবন্ত হয়ে মনের প্রাকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রাজার বিরুদ্ধে হ্যাপডেনের লড়াইকে একান্ত আপন করে দেখতে পেয়েছি। ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর লড়াইয়ের সঙ্গে একে দেখেছি অভিন্ন করে।

জাতির বুকের নিকষ কালো অন্ধকারে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে আগুনের ফুল্‌কি,—অগ্নিনালিকা গর্জে উঠছে—কোথাও হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ—সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় ছন্নছাড়া বিপ্লবী দলের অসমসাহসিক কর্মকাণ্ড। একান্ত ভাবে কামনা করতাম এদের

সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই বিপ্লবীরাই সেদিন ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলে মানুষের বুকের দরজায় ঘা মেরে গেছে। ছিল না কাকলী—ছিল না কোলাহল—ছিল না—শ্লোগান ধ্বনি—জয়ধ্বনিহীন হয়ে জয়যাত্রার ইতিহাস এমনি রচিত হল।

* * * *

সেদিন কল্‌তাবাজারে ফেরারী বিপ্লবী ও পুলিসের সঙ্গে হল গুলি বিনিময়, সারা শহরে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল সেই সংবাদ; রোমাঞ্চকর এই ঘটনা চমক লাগাল দেশের বুকে। চাপা সমর্থন লোকের চোখেমুখে,—মনে হল ঝিমিয়েপড়া বুকের পাঁজরগুলো দপ ক'রে জ্বলে উঠল। গুলিবিদ্ধ মরণপথযাত্রী বিপ্লবী যুবকের রক্তাপ্লুত দেহকে ঘিরে পুলিসের কি তৎপরতা! পুলিস সাহেবের প্রশ্ন—"কে তুমি যুবক? কি পরিচয় তোমার?" আহত যুবক স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে বলে—"আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" শেষ নিঃশ্বাস ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল—পরাজয় মানল না, শেষ মুহূর্তে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করল না, বিপ্লবী সাধনাকে জয়যুক্ত করেই চলল অমৃতলোকে। এর সম্বন্ধে কত কথাই শুনেছি—ভারী ভালো লাগছিল। কি অতুলনীয় চরিত্র! কি অদ্ভুত সুন্দর। পরে প্রকাশ পেয়েছিল—এই বিদ্রোহী গোহাটী সংগ্রামের বীর ফেরারী নলিনী বাগচী—অনুশীলন দলের কর্মী। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছে বারে বারে। জাতির বুকে অনেকগুলো শূন্যের সামনে এ যেন একটা বিরাট 'এক'। জাতির কাপুরুষতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে দিয়েছে এই ভাঙার পূজারীদল। অন্তরীণে, নির্বাসনে এরা একক যাত্রী, দেশের লোকের স্বপ্নের মানুষ।

বি. এ. পড়ছি ঢাকা কলেজে। মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সঙ্গে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার নতুন অধ্যায় শুরু হল, জালিয়ান-ওয়ালা-বাগে হিন্দু-মুসলমান-শিখের তাজা খুনে ভিজে উঠল পাঞ্জাবের উর্বর ভূমি। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে দেখল—ইংরাজের সভ্যতার মুখোশ খুলে গেছে।

সারা ভারত বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

গান্ধীজি এলেন ভারতের কংগ্রেসের আসরে, বিদ্রোহের নিশান হাতে। ভিক্ষাপাত্র হাতে যাঁরা এতকাল কংগ্রেসের আসর জমিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই অপসৃত হলেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশনে হল তার রূপান্তর। শাসক ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের নির্দেশ দিলেন গান্ধীজি। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে কংগ্রেস সামনে এসে দাঁড়াল,—এবার তার সাংগ্রামিকের বেশ। গোটা দেশ তাকে অভিনন্দিত করল—জাতির কণ্ঠের কলধ্বনি—"মহাত্মা গান্ধী কি জয়"—সংগ্রামের জয়ধ্বনি হিসাবে দেশ বরণ করে নিল।

গান্ধীজির প্রথম আহ্বান দেশের প্রাণবন্ত অংশ ছাত্র-সমাজের প্রতি। ইংরাজের শাসন-শৃঙ্খল ভাঙার কাজে তাঁর ডাক তরুণদের প্রতি,—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেলন—"গোলামখানা"।

পরাধীনতার বেদনা দুঃসহ মনে হল। বন্ধনহীন ঝরাপাতার মতোই প্রথম দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে চল্লাম। কলেজের অধ্যক্ষকে একখানি চিঠি দিয়ে জানালাম—"দেশমাতৃকার আহ্বানে ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিলাম"। আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নগেন ঘোষ নামে আমার এক ছাত্রবন্ধু। সম্ভবত আমরা দুজনই প্রথম সত্যাগ্রহী। এতে "কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার"। কয়েক মাস পরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হল—সে প্লাবনে গোটা দেশের ছাত্রসমাজ ভেসে গেল,—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হল ছাত্র শূন্য।

ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। আমি শুধু উদ্যোক্তাই ছিলাম না—শিক্ষক হিসাবে কাজ করে যেতে লাগলাম। এর পেছনে যাঁদের দান ছিল অতুলনীয় তাঁদের স্মরণ না করে পারা যায় না।—বিনয়

দত্ত, প্রিয়কুমার গোস্বামী, শৈলেন দাশগুপ্ত (রুণু), সুরেন বড়ুয়া, প্রমুখ ত্যাগব্রতী কর্মী সমাজ।

অসহযোগের সঙ্গে যুক্ত হল খিলাফৎ আন্দোলন। এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলে—ঢাকা জিলা কংগ্রেস অফিস প্রতিষ্ঠিত হল শংকরটোলায়,—পরিচালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হল আমার উপর এখান থেকেই হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তৎকালীন বিপ্লবী বাংলার শক্তিধর বহু ব্যক্তির সঙ্গে হল পরিচয়—ঘনিষ্ঠ সংযোগ,—তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডে স্বল্পকাল মধ্যেই আমি অপরিহার্য হলাম। সেদিন বাংলার অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন। তাঁরই স্নেহধন্য হয়ে আমার বিপ্লবীজীবনের যাত্রারম্ভ হয়। কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে—সর্বশ্রী কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য, আশুতোষ কাহিলী, তরণী-ভূষণ সোম, প্রবোধ দাশগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন দে, সুবোধ নাগ, নলিনীকিশোর গুহ, রমেশ চৌধুরী, গোবিন্দ কর, রবীন্দ্রমোহন সেন, বীরেন চ্যাটার্জি (বীরেনদা), ত্রৈলোক্য চক্রবর্তি (মহারাজ), মদন ভৌমিক, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন রায়, জিতেশ লাহিড়ী, জ্ঞান মজুমদার, সতীশ পাকড়াশী, নিশি পাইন, নলিনী ঘোষ, অমূল্য অধিকারী, ক্ষেত্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঘোষ, দেবেন্দ্র বণিক্য, যোগেশ চ্যাটার্জি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের আন্দোলন, আন্দোলন মাত্র, সংগ্রাম নয়—এর ফলে দেশে জাগরণ আসবে, কিন্তু স্বাধীনতা আসবে না,—এই সুনিশ্চিত ধারণা নিয়েই বিপ্লবীরা তখন কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত থাকায় মুসলমান সমাজের প্রাণবন্ত অংশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হল। আমি ব্যক্তিগতভাবে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে খিলাফতের কর্মী সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম। সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যে এগিয়ে গিয়েছি, এটা ঢাকা খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মী ও

নেতৃসমাজ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের কাজে আমি সেদিন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলাম। মুসলমান যুবকদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ভাবগত ও আদর্শগত যোগাযোগ হয়, তাদের মধ্যে আমি ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলাম। ধীরে ধীরে তাদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসই আমার ছিল। ঢাকার নবাব পরিবারের দুটি যুবক ইছাক ও সেলিমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ ওরাও রাজনীতিতে আসে। এদের কয়েকজন আমার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আজ মনে পড়ে ঢাকার শিরাজুল ইসলামের কথা। চমৎকার প্রাণধর্মের অধিকারী উদার হৃদয় যুবক, জীবনে কোন ছোট কাজ সে করতে পারে না। কারও বিরুদ্ধে কোন কার্যে তার অন্তর সাড়া দিতে পারে না, তার সান্নিধ্য আমার কাছে খুবই লোভনীয় ছিল।

বাহ্যতঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেও অনুশীলন দলের গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। কংগ্রেসের অফিস পরিচালনা করলেও আমার কাজ ছিল বিভিন্নমুখী। বিপ্লবীদের গোপন কার্য-কলাপের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা দান প্রভৃতি এক সঙ্গে সবই চলত। মুসলমান কর্মীদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমাদের বিপ্লবী কাজে মুসলমান যুবকদের অস্তিত্ব ছিল না কেন এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন। অনেকে তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন ওরা ইংরাজের সমর্থক, ওরা ভীরু। এমনি অনেক ছোট কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আমাদের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মনের কাছে মুসলমান সমাজের সত্যিকার ছবি ফুটে উঠতে পারেনি। ভীরু তো তারা নয়ই। ঢাকার দুই দুইটি শোভাযাত্রায় দেখেছি, বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনতা ইংরাজের গুলিগোলা, পুলিস মিলিটারী উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। শাসক ইংরাজ ঢাকা শহরে ত্রাসের মধ্যে বাস করেছে। অবশ্য খিলাফৎ কর্মীদের চলনে বলনে গান্ধীজির অহিংসার

মর্যাদা রক্ষা হয়নি। সাহস, শক্তি, উৎসাহ, আঘাত করার প্রেরণা—বিপ্লবী চরিত্রের এইসব গুণ এদের মধ্যে প্রচুর ছিল কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। এর ছুটো কারণ—উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমরা এগোতে পারিনি বলেই প্রাণবন্ত মুসলমান যুবকদের আমরা জাতীয় আন্দোলনের মাঝপথেই হারিয়েছি। মুসলমান কৃষক যারা সংখ্যায় বিপুল, তারা নির্যাতিত হয়েছে হিন্দু ছোট বড় জমির মালিকদের হাতে; এদের উপর তাদের একটা বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ইংরাজ রাজত্বের অবসান করে এই দেশের সর্বপ্রকার শোষণ আমরা বন্ধ করব, বিশেষ করে জমিদারী প্রথা লোপ করে কৃষককে তার জমির মালিক করব এবং এই জন্যই আমাদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রয়োজন—এরূপ কোন আদর্শবাদ তখন প্রচার করা হয়নি। বরং হিন্দু জমিদারের পীড়নের প্রতিবিধানের জন্য তাদের ইংরাজের দ্বারস্থ হতে হবে এই কথাটাই মুসলমান কৃষকেরা বুঝত। এই কারণেও জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের বজ্রমুষ্টি এক সঙ্গে উদ্যত হতে পারে নি। অজ্ঞান মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞানপাপী হিন্দু নেতাদের দোষই এক্ষেত্রে বেশী বলে আমার মনে হয়েছে। এক কথায় নেতৃত্বের হিন্দু মানসিকতা জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানদের সহযোগিতার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে।

১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হবে, এ প্রচার কংগ্রেসের; লোকের বিশ্বাস ও প্রতীক্ষা সত্যিই ছিল। কালের গতি-পথে ৩১শে ডিসেম্বর অতিক্রান্ত হল,—স্বরাজ এল না। অহিংসার প্রাকারে আবদ্ধ সংগ্রামের জোয়ার ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে মরল। বারদৌলীতে আইন অমান্যের চরম সংগ্রামের প্রতীক্ষা ছিল—ভারতীয় জনতার চৌরীচৌরার হিংসার বালুচরে অহিংস আন্দোলন হল গতি-হারা, হল স্তব্ধ।

গান্ধীজি নৈষ্ঠিক অহিংসাচারী, পররাষ্ট্রের শাসন ও শোষণ থেকে তিনি ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন রক্তহীন বিপ্লবের পথে। কিন্তু দু'শ বছর ইংরেজের শাসনে পর্যুদস্ত ও শোষণে জর্জরিত হয়ে ইংরেজ ও ইংরেজ শাসনের প্রতি জনসাধারণ যে দারুণ ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করত, আন্দোলনের উৎসমুখে তা স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বার হয়ে উঠেছিল। তাই সংগ্রামের সূচনায় আঘাত হানবার স্বাভাবিক প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গান্ধীজির নীতিবাদ বা বিচক্ষণ নেতাদের সংগ্রাম-কৌশল হিসাবে অহিংসাকে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুক্তিপাগল ভারতীয় জনসাধারণের দুর্জয় অগ্রগতি অহিংসার বদ্ধজলায় সেদিন পথ হারাল।

আমাদের দেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমসাময়িক কালে রাশিয়ায় শুরু হয়েছে বিপ্লবের জয়যাত্রা। এই বিপ্লবের হোতাদের সঙ্গে ভারতের অগ্নিপূজারীদেরও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে যাঁরা তার বাস্তব রূপায়ণে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে তখন সর্বশ্রী— রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র নাথ রায়, অবনী মুখার্জি, ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত, বীরেন চাটার্জি, বরকতউল্লা (ভোপাল), হরদয়াল সিংহ (পাঞ্জাব), রামচন্দ্র (পেশোয়ার), ভাই পরমানন্দ, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, তারকনাথ দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—তাঁরা সবাই ছিলেন আমাদের গর্বের বিষয়বস্তু। অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের রাশিয়া থেকে গোপনে ভারত আগমন আমাদের তরুণ বিপ্লবী মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

তিন

অসহযোগ আন্দলনের গতি স্তব্ধ হযে গেছে। জাতির বুকের ধূমায়মান বহ্নি কিন্তু গান্ধীজির নির্দেশে নিভে যায় নি। জাতিব মন বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বাংলার বিপ্লবী দলের কর্মীসমাজ অসহযোগের বিরতির পর স্বকীয় পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিপ্লবী সংস্থাগুলো সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, অধীরতাও দেখা দেয আঘাত হানবার জন্য। অনুশীলন দলের মধ্যেও ছুটি মত সুস্পষ্ট হযে উঠল।—নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ চাইলেন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে ইংরাজদের সঙ্গে একবার শক্তি পরীক্ষা শুরু করতে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাব বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে দলের শক্তি আছে—ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামে বাজশক্তিকে আঘাত করার কথাই তখন হচ্ছিল। এতে সফল বিপ্লব হবে না, তবে একবার আগুন জ্বালাতে পারলে একে নেভাতে রাজশক্তির প্রচুর বেগ পেতে হবে। সরকারী অস্ত্রাগার দখল করা, সরকারী ব্যাংক লুঠ করা, কারাগার ভেঙে দেওয়া, যানবাহন চলাচল ব্যাহত করা,—এব অনেকগুলোই ছিল প্রোগ্রামের অন্তর্গত। অন্যমতের সমর্থকেরা বল্লেন, আন্দোলন বন্ধ হযে গেছে। জনতাকে টেনে এনে আর বিপ্লব করা যাবে না। অসহযোগ আন্দোলন যদি আর কিছুকালও চলত, ইংরাজকে অসহযোগের অহিংস আঘাত হানার প্রোগ্রাম নিয়েও জনতাকে সহিংস আঘাতে প্রবুদ্ধ করা যেত। কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে পড়লেও ওদের হাত থেকে আক্রমণোদ্যোগের নেতৃত্ব বিপ্লবী নেতারা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু অসহযোগের আচমকা রুদ্ধগতি জনতার পশ্চাৎগামিতাতেই পর্যবসিত হয়েছে, কাজেই এ সময়ে বিপ্লবের আহ্বান সময়োচিত হবে না।

দলের মধ্যে এমনি ছুইটি মতের সমর্থক লোক থাকলেও প্রস্তুতির

ব্যাপারে সকলেই এক মত ছিল। এবং তারই আয়োজন পর্ব চলছিল অত্যন্ত সংগোপনে।

১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। "নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার" এর মধ্যে শক্তির লড়াই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের নতুন নীতি নির্ধারণের পক্ষে। মহাত্মার অন্তরঙ্গ হিসাবে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির পক্ষে;—সেদিন "নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার"-এর লড়াই কাউন্সিলে প্রবেশ করা না করাকেই কেন্দ্র করে চলেছিল।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার থেমে যাবার সাথে সাথে বাংলার বিপ্লবী দলের মধ্যে সহিংস আঘাতের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। এর এক অংশ অবিলম্বে কর্ম সম্পাদনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বাংলার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্লবীরা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরাজ শাসনকে আঘাত করতে পারে নি। তাই সেদিনের আঘাত প্রচেষ্টাও ছিল বিচ্ছিন্ন। কলকাতার বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্রের দলের কর্মপ্রচেষ্টা শাঁখারিটোলা ও উল্টাডাঙ্গা পোস্ট অফিসে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ, দলের বিশ্বাসঘাতক কর্মীর জীবনাবসান চেষ্টায় মির্জাপুরে এক দোকানে বোমা-নিক্ষেপ ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা পুলিস কমিশনার টেগার্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক নিরপরাধ শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীকে হত্যা করে।

কলকাতার জন ও যানমুখর রাস্তা—অফিসের সময় ভিড়ের অন্ত নেই। যুবক গোপীনাথ দুর্ধর্ষ টেগার্টের প্রাণ হননের নেশায় বিভোর হয়ে পথে বেরিয়েছে। টেগার্টকে দু'চারদিন লক্ষ্যও সে করেছে। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী মিঃ ডে'র চেহারার সঙ্গে টেগার্টের চেহারার সাদৃশ্যও কিছুটা হয় তো ছিল। গোপীনাথের হাতের রিভালভার মুহুর্মুহু গর্জে উঠল। যুবক অচঞ্চল লক্ষ্যে তার রিভালভার চালিয়ে চলেছিল।

শেষ টোটাটি পর্যন্ত নিক্ষেপ করে গোপীনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কৌতূহলী জনতার সাথে পুলিসও এতক্ষণ ছিল নির্বাক দ্রষ্টা। এবার পুলিস দল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসির হুকুম হল। বীর যুবক হাসি মুখে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করল। তার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর বন্দনা চারিদিক থেকে উৎসারিত হল—তার দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে।

এই সময় এই দিল্লী কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই অনুশীলন দলের নিখিল ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃত্বের সমাবেশ হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলায় বিপ্লবী নেতৃত্বে যাঁরা আসীন ছিলেন, তাঁদের উপরও নির্দেশ ছিল দিল্লীতে সমবেত হবার। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগের ফলে দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সহজেই বিপ্লবী কর্মীরা পেয়েছিল! দিল্লীতে আমাদের দলেব নিখিল ভারতীয় সদস্যদের গোপন বৈঠকে ভাবী কর্মকাণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তা ছাড়া বাংলার বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট কর্মীদেব সঙ্গেও আমরা অতরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এই দিল্লী কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে।

দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফিরবার পথে হাওড়াতে বাংলার বিপ্লবী নেতারা অনেকেই "তিন আইনের" কবলে বন্দী হন। সুভাষচন্দ্র এই বন্দীদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন। পরবর্তী কালে ফেরারীরাই বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তখনও অনুশীলন দলের নেতা সর্বশ্রী নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী,

রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন এবং আশুতোষ কাহিলী ফেরারী জীবন অবলম্বন করে দলের বিপ্লবী প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় প্রধান কেন্দ্র ঢাকাতেই বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। রাশিয়া প্রত্যাগত নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনায় বোমার মালমশলা সংগ্রহ ও কিছু কিছু পরীক্ষা (experiment) চলছে। বিভিন্ন জেলা থেকে বিশ্বস্ত কর্মীদের আনাগোনা চলছে এই উপলক্ষে। তখন আমি বাহ্যতঃ কংগ্রেসের পরিচালনের দায়িত্বের সহিত যুক্ত থাকলেও ফেরারী নেতৃদ্বয়ের (নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা—বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের গোপন দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা ও অন্যদিকে বোমা প্রস্তুতির আস্তানার সাথেও সংযোগ রক্ষা করা প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। এই সময় শ্রীবীরেন চ্যাটার্জির (বীরেনদার) পরিচয় নিয়ে নোট জালের একজন বিশেষজ্ঞ ঢাকায় এলেন। দলের প্রয়োজনে অর্থ ছিল অপরিহার্য। এতকাল দলের নিষ্ঠাবান ও সম্পন্ন কর্মীদের অর্থে ও ডাকাতির দ্বারা লব্ধ অর্থে কাজ চলেছে। ডাকাতির পথে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে, ডাকাতির জন্য খুন এবং সেই খুনের মামলা চালাতে গিয়ে আবার ডাকাতি করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এতে কাজের ক্ষতিও হয়েছে বিপুল। এ জন্যই নোট জালের পরিকল্পনা করা হয়। এপথ কিছুটা নিরাপদ এবং ইংরাজের অর্থ ভাণ্ডারের উপর পরোক্ষ আঘাত এতে পড়তে পারত। নোট জাল করেই টাকার ব্যবস্থা হলে কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বৃহত্তর কর্ম সমাধা সম্ভব হয়। কাজ এগিয়ে চলল—আস্তানা তৈরী হল, বিশ্বস্ত সহকর্মী শচীন চক্রবর্তী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত সব কাজ ফেলে এই কার্যে সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করল। দলের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি নিজেও এই নোট জাল ব্যাপারে গভীর ভাবে যুক্ত হই। এই বিষয়ে আমরা ক্রমেই সফল হচ্ছিলাম।

* * * *

১৯২৪ সালের শেষের দিকে আটক আইন **Bengal ordinance** জারী হল,—যে রাত্রে **ordinance** জারি হল সেই রাত্রেরই শেষ দিকে

বাংলার সর্বত্র খানাতল্লাস ও ধরপাকড় আরম্ভ হল। পূর্বে স্বল্প সংখ্যক বিপ্লবী নেতা তিন আইনে ধৃত হয়ে রাজবন্দী-জীবন যাপন করছিলেন। এবার প্রত্যেক জেলা থেকেই বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী করা হল। গোটা বাংলা দেশ থেকে প্রায় দুই শত বিপ্লবী কর্মীকে বিনা বিচারে আটক কবা হল। আমিও সেই সময়ে ধৃত হই। আমাদের আরব্ধ বিপ্লব প্রস্তুতি অর্ডিন্যান্সের ফলে ব্যাহত হয়। ঢাকা শহরে ব্যাপক খানা-তল্লাসী হল। কিন্তু গ্রেপ্তারের বেলায় বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের উপর হল প্রথম আঘাত। বিনা বিচারে অবরুদ্ধ হয়ে আমরা রাজবন্দীব তা'লিক. দীর্ঘ করলাম।

* * * *

১৯২৪ সাল।

বহ্নিমান এই বছরটি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগের শ্বেত শিখাটি নিভে গেল; কিন্তু জনচিত্তের ধূমায়মান বহ্নি ভারতের বিপ্লবী আধারে মাঝে মাঝে লোহিত শিখায় জ্বলে ওঠে। বাংলার বিপ্লবী তরুণের হাতের অগ্নিনালিকা এখানে সেখানে গর্জে ওঠে;—দেশের বুকের তমিস্রা ভেদ করে জ্বলে ওঠে বহ্নিশিখা। অর্ডিন্যান্সের মুগুরাঘাত এ আগুন নেভাতে পারে নি। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের প্রাণবন্ত কর্মীদের মধ্যে হল যোগাযোগ। দিল্লী কংগ্রেসের পরে তিন রেগুলেশনে ও পরবর্তী অর্ডিন্যান্সের বেড়াজালে বিপ্লবী নেতা ও কর্মী সমাজের অনেকেই কারারুদ্ধ, কিন্তু গ্রেপ্তাব এড়িয়ে ফেরারী জীবন যাপন করছেন এমন নেতা ও কর্মী তখনও ছিলেন। অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বোমা প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের যে আয়োজন চলছিল,—নেতা ও বিপুল সংখ্যক কর্মীর গ্রেপ্তারের পরেও তা খণ্ড খণ্ড ভাবে এগোতে থাকে। আমাদের স্বপ্ন ছিল বিপ্লবী অভ্যুত্থান। কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের কারও কারও

মনে ছিল অচিরেই বিপ্লবী আঘাতের আয়োজন করা। আঘাত যদি দুর্বার করে তোলা যায়, অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র রচনা করা সহজ হয়—এই বিশ্বাস ছিল অনেকের। এই শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী অনুশীলন দলের কিছু কর্মী বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দলের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, রাজেন লাহিড়ী, চারুবিকাশ দত্ত, প্রমোদরঞ্জন, যতীন দাস, ঢাকার সুধীর ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে। এঁরা বাংলাদেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলের কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেদিনের যুগান্তর দলের কর্মীদের মধ্যে সর্বশ্রী হরিনারায়ণ চন্দ, বীরেন ব্যানার্জি, নদীয়ার অনন্তহরি মিত্র, চট্টগ্রামের সূর্য সেন, নগেন সেন (জুলু), বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ শক্তিশালী কর্মীদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিষ দা (অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) এই সম্মিলিত বিদ্রোহী তরুণদের সমর্থন করেছিলেন।

সেবারে বিপ্লব প্রস্তুতিতে অনুশীলন দলের বিশিষ্ট নেতা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যালের ভূমিকা বিপ্লবী দলের প্রচলিত ব্যবস্থায় এক নতুন পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তিনি বাংলার অনুশীলন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁদের সম্মতি ও সহযোগিতায় "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন" নামে এক নতুন বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেন। তদনুযায়ী স্থির হয় অনুশীলন দলের কর্মী অপরাপর দলের কর্মীদের সঙ্গে এই নামে বাংলার বাইরে—উত্তর ও দক্ষিণভারত সহ পাঞ্জাবে এবং বাংলার অভ্যন্তরেও কাজ করবেন। তৎকালে উত্তরভারতে এই নামে পার্টি কাজ করতে আরম্ভ করে এবং বাংলায়ও এই নামে কেউ কেউ কাজ করতে থাকেন।

বাংলার বাইরে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণভারতে এই সংগঠন বিস্তারের জন্য বিখ্যাত বিপ্লবী কর্মী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুশীলন দল থেকে প্রেরণ করা হয়। যোগেশবাবুর অধ্যবসায় ও কর্মতৎপরতায়

যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে সংগঠন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনের ওপর ত্বরিত আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে কলকাতা ও কলকাতার সন্নিকটে বোমা তৈরি করবার জন্য দুটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কলকাতার কেন্দ্রে প্রখ্যাত বীর বিপ্লবী সূর্য সেন ও পরবর্তীকালের শহীদ প্রমোদরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বর কারখানায় উপস্থিত ছিলেন অনন্তহরি মিত্র, বীরেন ব্যানার্জী প্রমুখ।

শ্রীযতীন দাস ও বিশ্বনাথ মুখার্জী উভয় কেন্দ্র ও শচীন সান্যালের ফেরারী আড্ডায় যোগরক্ষার সাথে বোমা তৈরির কাজেও সহায়তা করতেন। এখানে অনুশীলন, হাওড়া, নদীয়া ও চট্টগ্রামের দল মিলিত হয়েছিল। কলকাতার সন্তোষ মিত্রের দলের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল।

প্রমোদরঞ্জন অনুশীলন দলের চট্টগ্রাম শাখার সদস্য ছিলেন। অনুশীলন দলের নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নির্দেশে চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত প্রমোদরঞ্জনকে ঢাকা থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য, বোমার খোল প্রভৃতি নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলে লেখক উক্ত সামগ্রী পার্টি ভাণ্ডার থেকে দেবার জন্য আদিষ্ট হয় এবং পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় বোমার কারখানায় যোগদানের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশও পায়।

অর্থ সংগ্রহে সাহায্যের জন্য অনুশীলন দলের বিশিষ্ট কর্মী ও দীর্ঘ কারাদণ্ড-ভোগী আন্দামান প্রত্যাগত বিপ্লবী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কর ঢাকা থেকে উত্তরপ্রদেশে প্রেরিত হন এবং লক্ষ্ণৌ স্টেশনের অদূরবর্তী কাকোরী স্টেশনে সরকারী টাকা লুণ্ঠনের ট্রেন ডাকাতিতে তিনি অংশ-গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবী ইস্তাহার 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন' নামে শচীন সান্যাল প্রকাশ করেন।

প্রচণ্ড বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরির সার্থকতার মুখে পুলিসী হানায় উভয় বাড়িতে অনেকেই ধরা পড়ে যান। এর মধ্যে যাঁরা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহরি, বীরেন্দ্র ব্যানার্জি, হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্ত কুমার চক্রবর্তী,

রাখালচন্দ্র দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর চৌধুরী, ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—সূর্য সেন, যতীন দাস, বিশ্বনাথ মুখার্জি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁরা দণ্ডভোগকালীন অবস্থায় এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে কুখ্যাত দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা অফিসার ভূপেন চ্যাটার্জিকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করেন এবং এঁদের মধ্যে তিনজন-প্রমোদ, অনন্ত, বীরেন মৃত্যুদণ্ডে এবং সাতজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টের আপীলে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরির ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে এবং তাঁরা শহীদ হন। অপর সাথীদের ফাঁসির দণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

ইতিমধ্যে শচীন সান্যাল ধরা পড়ে যান এবং বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সংগঠনের কাজ করে দক্ষিণভারত থেকে বাংলায় ফেরার পথে কলকাতায় হাওড়া পুলের উপর যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কিছু কাগজপত্র সহ ধরা পড়ে যান এবং বহরমপুর বন্দীনিবাসে প্রেরিত হন।

অতঃপর দ্রুতগতিতে বিপর্যয় ঘটতে আরম্ভ করে। কাকোরী ট্রেন ডাকাতি অনুসন্ধানের ফলে যে ব্যাপক খানাতল্লাশী ও গ্রেফতার উত্তরভারতে ও বাংলার নির্দিষ্ট স্থানে হয় তার ফলে ১৯২৫ সনে 'কাকোরী ষড়যন্ত্র' মামলার উদ্ভব হয়। এই মামলায় হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের চারজন সদস্য—আসফাকউল্লা, রোসন সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল ও রাজেন লাহিড়ীর প্রাণদণ্ড হয় এবং সর্বশ্রী শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জি, গোবিন্দ কর, শচীন বক্‌শী ও মুকুন্দিলাল যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হন,—অপর সাথীরা দীর্ঘদণ্ডে দণ্ডিত হন—এর মধ্যে ছিলেন মন্মথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী, বিষ্ণুচরণ দুবলিশ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ১২ জন। বিপ্লবী আঘাতের প্রস্তুতি ও সংগঠনগুলি এই

উভয় মামলার ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এই ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে বীজ তাঁরা রোপণ করে গিয়েছিলেন, তাহাই উত্তরকালে সমগ্র ভারতে ও বাংলায় বিদ্রোহের আকারে দেখা দিয়েছিল।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা এবং কাকোরী ষড়যন্ত্রে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা বিপ্লবীদের যোগাযোগ বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয়।

এর পরের অধ্যায় শেষ হয় দেওঘর শহরে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে নেতৃত্বহীন কর্মীর দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এক নব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে বিহারের গিরিডি শহরে সমবেত হন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও বাংলার অনেক কর্মী এতে জড়িত ছিলেন। বোমা বানিয়ে ও অস্ত্র সংগ্রহ করে বৈপ্লবিক আঘাত হানবার পরিকল্পনা ছিল। পুলিস সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অনুসরণ করে গিরিডি শহরে কোনও এক বাড়িতে হানা দিলে, অনেকে ধরা পড়েন। শ্রীহট্টের উপেন ধর শৈলেন চ্যাটার্জী, অনুশীলন দলের বীরেন ভট্টাচার্য, সুখেন্দু বিকাশ দত্ত সহ অনেকে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন ও অনুশীলন দলের বিশ্বস্ত কর্মী পাঞ্জাবের অধিবাসী ইন্দ্রচন্দ্র নারাং-এর সহযোগিতা ছিল কিন্তু তাকে বিচারে দণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই। লাহোরের প্রখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক ও ঐতিহাসিক শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ইন্দ্রচন্দ্র নারাং-এর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সমগ্র পরিবারটি ছিল স্বাদেশিকতার আদর্শে ও বৈপ্লবিক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ। ইন্দ্র নারাং লাহোর হ'তে যাদবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র হিসবে ভর্তি হয়ে বাংলা ও পাঞ্জাবের যোগসূত্রের কাজ করত। পাঞ্জাবী হলেও ইন্দ্র নারাং বাংলা ভাষা চমৎকার বলত—ঢাকার কথ্যভাষা

সে এমন সুন্দর বলতে পারত যে তাকে ঢাকার লোক বলেও অনেকে ভুল করত। হাসি গল্পে প্রাণ খোলা তরুণ ইন্দ্র নারাং আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এই সময়ে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের সংখ্যা ছিল দুই শতেরও বেশী। দক্ষিণেশ্বর ও কাকোরী ষড়যন্ত্রে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য ছিল না।

এ ছাড়া ফাঁসির মঞ্চে আত্মদান করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত ও পরে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুর জেলের মধ্যে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছিলেন চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের কর্মী প্রমোদ চৌধুরী ও নদীয়ার যুগান্তর দলের অনন্তহরি মিত্র। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যে চার জনের ফাঁসি হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন —রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউল্লা, রামপ্রসাদ ও রোসন সিং।

চার

১৯২৭ সালের শেষ দিকে বাংলায় রাজবন্দীরা ক্রমেই কারাগার ও অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রের দিকে ফিরে এল। আমার উপর তখন বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার হুকুম হয় এবং কিছুকাল নৈনীতালে থাকবার পর বাংলা দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে ফিরে এলাম। এই চার বছর জেলে আটক থাকার ফলে বিপ্লবী কর্মকেন্দ্রগুলো একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ-সূত্র হারিয়েছিল। তাই ছেঁড়া তার জোড়া লাগানোর কাজ শুরু হল নতুন করে। এবার জেলখানায় নূতন ভাবে চিন্তা করার সুযোগ মিলেছে। একই জেলে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতা ও কর্মীরা এক সঙ্গে বাস করাতে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ও হৃদ্যতা বেড়েছিল এবং ভবিষ্যতে

জেলের বাইরে গিয়ে এক সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সুযোগ এবার এল।

ছাড়া পাবার পরেই দুই বিপ্লবী দলের উপরের স্তরের নেতারা পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিলেন। কর্মীরাও নতুন উদ্যমে গড়ে তুলছেন সংগঠন। গোড়ার দিকে সবারই মনে একটা আশা জেগেছিল—বাংলার এই দুইটি দল এক হতে পারলে বিপ্লবী সংস্থা যেমন মজবুত হবে তেমনি ইংরজেকে আঘাত দেবার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, মিলনের আশা ততই দূরে সরে যেতে লাগল। প্রোগ্রামে অমিল হয় নি, অমিল হল স্থানীয় কর্তৃত্ব নিয়ে। নেতৃত্বের বেলায় যেমন বাধা এসেছে তেমনি বাধা এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় দুই দলেরই একত্র সংগঠন পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রাধান্যের প্রশ্নই সেখানে বড় হয়ে দেখা দিল। এক দল আর এক দলের স্থানীয় নেতার উপর নির্ভর করতে পারছিল না। এই দুই দলের মিলন প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল।

উভয় দলের তলার দিকের বহু কর্মীর মধ্যে একটা ঘনায়মান অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হল। উপরের স্তরে যদি মিলন না ঘটে তবে একটা জোরালো প্রোগ্রাম নিয়ে দুই দলের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা নতুন ভাবে সংগঠন গড়বে। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত উপরের স্তরের মিলনপ্রচেষ্টা চলছিল। এ পর্যন্ত এসেই এ উদ্যমে ছেদ পড়ল। উভয় দলের অসহিষ্ণু কর্মীরা এবার তলে তলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে লাগলেন। দুই বিপ্লবী দলের অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী কর্মীদের অন্তর্দ্রোহের ফলে বৃহৎ সংগঠনগুলো ভেঙে পড়তে লাগল।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনুশীলন দল অধিকতর কেন্দ্রিক ও দলীয় নিয়মশৃঙ্খলার অনুবর্তী ছিল। স্বর্গীয় পুলিনবিহারী দাসের লৌহকঠিন শৃঙ্খলার ছাপ তখনও দল থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তৎসত্ত্বেও

অনুশীলন দলেও যথেষ্ট ভাঙন দেখা দিল। যুগান্তর দলের মধ্যে বিকেন্দ্রিক মনোভাব সমধিক পরিস্ফুট ছিল। কারণ এই দলটি ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার পরিচালনাধীন দল সমূহের সমবায়ে গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার নামেই দলের স্থানীয় পরিচয়। অনুশীলন দলে কিন্তু কোন দলনেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত ছিল না। একজন ভালো কর্মী একটা জেলায় সাফল্যের সঙ্গে দল গঠন ও পরিচালনা করতে পারলে তাকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় দলের প্রয়োজনে গিয়ে দলের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সবই দলের প্রয়োজনে ও দলের নির্দেশে করা হয়েছে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গঠনতান্ত্রিক পার্থক্য এমনি ছিল। এই কারণে 'বক্ষক্ক, অসহিষ্ণু কর্মী সমাজের প্রচেষ্টা সাফল্যের সঙ্গে যুগান্তর দলের মধ্যেই গভীরতর ভাঙন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সময়ে অনুশীলন দলের অন্যতম প্রধান আড্ডা ছিল ১৬৭ নং বৌবাজার স্ট্রীটে। সেখান থেকে শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত দলের পরিচালনায় সাহায্য করতেন। নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রতুল গাঙ্গলী, রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। কেদারবাবু রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে দলের প্রাণ-কেন্দ্রে বসে আছেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দলের কাজ করে চলেছেন। তূলার ব্যবসা সূত্রে বহির্বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দলের জন্য অর্থ সংস্থানও করেছেন এই পথে। দধিচীর অস্থিদানের জীবন্ত প্রতীক। যক্ষারোগে আক্রান্ত বিশীর্ণ দেহ মানুষটি বিপ্লবী যাত্রাপথের দিশারী—প্রেরণা-দাতা, মন্ত্রগুপ্তির সিদ্ধসাধক কেদারবাবুর পরামর্শ দলের নেতৃস্থানীয়দের নিকট অপরিহার্য ছিল। বিশিষ্ট কর্মীদেরও কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে তাঁরাও উপস্থিত হতেন। দলের জন্য অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ইত্যাদি ব্যাপারে কেদারবাবুর পরামর্শ ছাড়া চলত না।

ঐ কঙ্কালটিকে দেখে কেউ কি কল্পনাও করতে পারে—কত বড় শক্তির আধার ছিলেন এই মানুষটি! দলের প্রতিটি কর্মীর জন্য কী অতুলনীয় দরদ ওই শুষ্ক পাঁজরগুলোর তলে! অহর্নিশ ধ্যান জ্ঞান মনন—একটি আদর্শকে ঘিরে।

কলকাতা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বর্তমানের ডি. রতন ফটোগ্রাফারের পাশের বাড়িতে আমরা তখন কয়জন মিলে থাকবার ব্যবস্থা করি। সেখানে শ্রীরমেশ আচার্যকে নিয়ে আমরা দুইতিন জন বাস করতাম। রান্নাবান্না সব স্বহস্তেই চলতো। পরিশ্রম একটু বেশী হলেও ব্যয় অনেক কম। কিছুটা স্বপাকের প্রেরণা এখানে। এতদ্ব্যতীত সতর্কতার খাতিরেও পরিচারক নিয়োগ করা চলে না। কারণ গোয়েন্দা বিভাগের দরাজ পুরস্কার পেয়ে অনেক সময় এদের ভূমিকা হত সংবাদ সরবরাহকারীর। এখানে প্রতুল বাবু, রবিবাবু সবাই আসতেন। বিভিন্ন জেল থেকে দলের পরিচালকরাও মাঝে মাঝে আসতেন। পাশের বাড়িতেই থাকতেন শ্রীবীরেন চ্যাটার্জী সপরিবারে,—বাংলার বিপ্লবী মহলে তিনি 'বীরেনদা' নামেই সুপরিচিত। অগ্নিযুগের প্রথম দিকে বীরেনদার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতার বহু গল্প মুখে মুখে প্রচারিত ছিল, তার মধ্যে আছে ইংরেজ পুলিসকর্তা মিঃ লোম্যানের হাত ভেঙে দেবার ঘটনা। বীরেনদার সাহস ও শক্তির পরিচয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা নত মস্তকে সব মেনে নিতাম। উপরটা দেখতে মনে হত বাপ-রে কি কঠিন! কিন্তু ভেতরটা ছিল দলের ছেলেদের জন্য কোমল স্নেহে ভরা।

অনুশীলন দলের বিক্ষুব্ধ বন্ধুদেরও কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় আনাগোনা ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, তারা সম্মিলিত ভাবে একটা আঘাত হানবার পরিকল্পনা করছে। চট্টগ্রামের পাহাড় পরিদর্শনের খবরও পেলাম। এদের আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল। তখন অস্ত্র

সংগ্রহের জোর চেষ্টা চলছিল। কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করেই এরা আঘাত হানবে ঠিক করেছিল। এদের ধারণা ছিল একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা সফল আঘাত হানবে। ক্ষুদ্র সফল আঘাত বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনা করবে ও গোটা দেশের বিপ্লবী তরুণ সমাজ প্রবুদ্ধ হবে বৃহত্তর আঘাতের ক্ষেত্র রচনায়।

বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে বিপ্লবীদলগুলোর তরুণ কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। বাংলার বিপ্লবী ষড়যন্ত্র এতাবৎ কাল ষড়যন্ত্রের স্তর পেরিয়ে এসে অভ্যুত্থানের স্তরে উঠতে পারেনি। আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই রাজশক্তির আঘাত এসে আচমকা ভেঙে দিয়েছে প্রস্তুতি, উদ্যোগপর্ব অকস্মাৎ বিয়োগান্তক রূপ পরিগ্রহ করেছে—ইতিহাসের এই মর্মান্তিক অধ্যায়গুলোর উপরই তরুণ কর্মীদের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়েছে। যে কোন অবস্থায় একটা কঠিন আঘাত বিদেশী রাজশক্তিকে দিতে হবে—প্রবল আগ্রহ এই দিকে গতি নেয়। বিপ্লবের ঝড়ে ইংরেজের রাজ্যপাট ধূলিসাৎ করার স্বপ্ন এবার বিদ্রোহীর দুর্জয় আঘাত হানার সসীমতার প্রাকারে যেন আবদ্ধ হতে চলল।—বিপ্লবী রূপান্তরিত হতে চলল বিদ্রোহীতে।

বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য—এই কর্মসূচী রচনায়। ব্যাপকতর সংগঠন ও সুনিশ্চিত প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্রোহ সম্ভব নয়, এরূপ ধারণা আমরা পোষণ করতাম বলেই বিদ্রোহী বন্ধুদের প্রচেষ্টা থেকে আলাদা হয়ে অগ্রসর হবার জন্য আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হলাম।

ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ঠিক হল, ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহায়তায় জাপানের সাহায্য পাবার জন্য অনতিবিলম্বে একজনকে পাঠাতে হবে এবং তদনুযায়ী শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য মহাশয় জাপানে যাবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হ'তে নির্দেশ দিলেন।

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সরগরম হ'তে শুরু করেছে। বিক্ষুব্ধ বন্ধুরা তাদের বৈপ্লবিক প্রস্তুতি দ্রুত অগ্রসর করে

যেতে লাগলেন। বোঝা যাচ্ছে যে শীঘ্রই তাঁরা আঘাত হানবেন। কলকাতা ও মফঃস্বলের গোয়েন্দা পুলিস তৎপর হয়ে উঠেছে। সহস্র সহস্র গুপ্তচর বিপ্লবী দলের সভ্যদের ও তাদের বিভিন্ন আড্ডাগুলি জানবার জন্য নানাভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজারে এক মেস্‌বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিস পেল, তাজা বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বহু বিশিষ্ট নায়ক ও কর্মীরা ধরা পড়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

১৯৩০ সাল, ১৮ই এপ্রিল রাত্রিবেলা চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবীরা উড়াল বিদ্রোহের নিশান। অস্ত্রাগার দখল ও লুণ্ঠন করে বিদ্রোহী বন্ধুরা পেল অস্ত্রের রাশি। সরকারী ভবন আক্রমণের সঙ্গে চল্‌ল পাহাড়ে ও রাস্তায় সরকারী সৈন্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আশ্রয় নিল বন্দরে।

ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মধ্যরাত্রে বেতার যোগে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মারফত চট্টগ্রামের বিদ্রোহের এই সংবাদ পেল। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত করল রাত্রের অন্ধকারেই বিশিষ্ট ও চিহ্নিত বৈপ্লবিক পার্টির সভ্যদের গ্রেফতার করে জেলে পুরে দিতে যেন তাঁরা দিনের বেলায় সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহের বিস্তারে সহায়তা করতে না পারেন। ভোর হ'বার আগেই বাংলার সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

১৮ই এপ্রিল পৌঁছেছি গিরিডি শহরে—ভ্রাতৃ-বধূর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার খবর পেয়ে। পরদিন বিদ্রোহের সংবাদ শহরে পৌছাবার পূর্বেই বিহারের ডেপুটি পুলিসকর্তা কলকাতার পুলিসের নির্দেশে দলবলসহ গিরিডি এসে হাজির হল এবং গ্রেফতার করে বাংলায় পাঠিয়ে দিল।

পাঁচ

বিনাবিচারে আটক বন্দী আমরা। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমেই ভর্তি হচ্ছে। বিভিন্ন দলের নেতারা ও কর্মীদল ক্রমে গ্রেফতার হ'য়ে আসছেন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামীদের মধ্যে জগদীশ চ্যাটার্জি, নির্মল দাশ প্রমুখ যে চার জনকে ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো গেল না, তাঁদেরও রাজবন্দী করে এখানে পাঠানো হল। অনুশীলন দলের কর্মী জগদীশ চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে থেকে বিদ্রোহ করে যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র তাঁদের সবারই মিলিত প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টার সূচনাতেই মেছুয়াবাজারে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তাতে তাঁদের ব্যাপকভাবে আঘাতের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়কেরা ছিলেন বিদ্রোহীদের একটি প্রধান অংশ। বাংলার অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহীদের সাথে একই পরিকল্পনায় ব্যাপক ও গুরুতর আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে এঁরাও যুক্ত ছিলেন। মেছুয়াবাজারে বিপর্যয় ঘটায় এবং বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েক জন ধৃত হবার ফলে ব্যাপক আঘাত অসম্ভব হল। এর পরে চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা যে একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তা সহজেই বোঝা গেল। বুঝতে কষ্ট হয় না বাংলার বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভাব গড়ে না ওঠায় যুগপৎ শক্ত আঘাত হানা সম্ভব হয় নি। তা'ছাড়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ কলকাতায় বেতার যোগে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা প্রদেশময় যে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়, তাতে তাঁদের প্রস্তুতির প্রচেষ্টার উপরও কঠিন আঘাত পড়ে।

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর গভর্নমেণ্ট বাংলার বিপ্লবীদল-গুলোকে ভেঙে দেবার জন্য তৎপর হল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা এই

বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে যাঁরা সমর্থন করতেন না,—সরকার এইসব বিপ্লবীদেরও রেহাই দিল না। এই অবস্থায় আমাদের দলের কয়েক জন কর্মী আত্মগোপন করে দলের ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেব পরের ক'টি বছর ছিল আগুন-রাঙা। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিদ্যুৎ ঝলক। কিন্তু এ আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস মাত্র। দেশের এ কোণে সে কোণে অগ্নিনালিকা গর্জে ওঠে। কোথাও কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথাও জজসাহেব, জেলের কর্তা, কোথাও পুলিস কর্মচারী, আঘাতের লক্ষ্যস্থল হয়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ারে কলকাতার দোর্দণ্ড প্রতাপ পুলিস কমিশনার টেগার্টের উপর যে প্রচণ্ড বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে টেগার্ট সাহেব বেঁচে যায়,—একজন বিপ্লবী কর্মী ঘটনা স্থলে নিহত হন এবং তরুণ বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় ধৃত হন। ঢাকাতে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেট হডসন্ ও বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা লোম্যানের উপর যে আক্রমণ হয় তাতে লোম্যান নিহত ও হডসন্ গুরুতর ভাবে আহত হয়। কলকাতায় সুরক্ষিত রাইটার্স বিল্ডিংএ বিনয়, বাদল ও দীনেশ কাবা বিভাগের প্রধানতম কর্তা সিমসন্‌কে তাঁর সুরক্ষিত অফিস গৃহে হত্যা করে। কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিস কমিশনার টেগার্ট ও হোম মেম্বার হাচিন্স প্রভৃতির পরিচালনায় যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রতিশোধের প্রেরণাই ছিল এই আক্রমণের মূলে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের (পেডী, ডগলাস, বার্জ) উপর পর পর আক্রমণ করা হয়। এই তিন জনই বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়।

বিপ্লবীরা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর—বিপ্লবী বাংলার প্রাণচাঞ্চল্য সত্যিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক চেতনাকে চরম নিপীড়নে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পেডী প্রমুখ অত্যাচারী শাসকেরা যেমন

তৎপর হয়েছিল, বাংলার বিপ্লবীর অগ্নিনালিকাও তেমনি বজ্র নির্ঘোষে গর্জে উঠেছিল। কুমিল্লার জেলা মেজিস্ট্রেট স্টিভেনস্ বিপ্লবী নারী শান্তি ও সুনীতির রিভালভারের গুলিতে নিহত হয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্নরের উদ্দেশ্যে বাংলার বীর কন্যা বীণা দাসের অগ্নিনালিকার ক্রুদ্ধ গর্জন কলকাতার সেনেট হলে প্রতিধ্বনিত হয়। আলিপুরের দায়রা জজ গার্লিক বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট 'ডুর্নো' গুলিতে আহত হয়। তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র ভারত বিদ্বেষী "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনও বিপ্লবীদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এই সব আক্রমণ বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সমগ্রভাবে এর প্রতিক্রিয়া শ্বেতাঙ্গ সমাজের উপর সামান্য ছিল না। মেদিনীপুরে পরবর্তী কালে এই কারণেই শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ সম্ভব হয় নি।

দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে খানাতল্লাশীর চালুনি চালা। যেখানেই একটু প্রাণের স্পন্দন দেখা গেছে সেখানেই তার টুঁটি চেপে ধরা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমে ভরে গেল। স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। নৈশ **Lock up** শিথিল করে সেলের বাইরে ক্যাম্পখাট দিয়ে শোয়াবার ব্যবস্থা হল। তাতেও কুলোয় না।

নতুন বন্দী শিবির না খুলে সরকারের আর উপায় রইল না। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে ভুটান সীমান্তবর্তী জয়ন্তী পাহাড়ের পুরানো বক্সা দুর্গ বন্দী শিবিরে পরিণত হল। শুধু স্থান সংকুলানের জন্যই এই দুর্গম স্থানের ব্যবহারের কথা সরকার ভেবেছে, তা নয়। বাংলা দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, এই সব বন্দীদের দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হল।—বক্সা-দুয়ার স্টেশন থেকে বক্সা দুর্গের দূরত্ব সুদীর্ঘ। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চড়াই উৎরাই পার্বত্য পথ। গভীর অরণ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি। শুধু পথের দুর্গমতা ও শ্বাপদকুলের উপর নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ছিল

না। অবাঞ্ছিত লোকের যাতায়াত রোধ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিও পথের মাঝে স্থাপিত হল। অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা থমথমে ভয়াবহতা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে দু একটি পাহাড়ী ভুটিয়াকে পাহাড়ী পথে ওঠা-নামা করতে দেখা যায়। ক্যাম্পে বসে মনে হল আমরা যেন একটা আলাদা জগতে বাস করছি—মানুষের জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলার বিভিন্ন জেলেও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ভিড় জমে গেছে। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে দেড়শ'র মত রাজবন্দী এনে এই অরণ্য শিবির ভর্তি করা হল। অনুশীলন দলের কল্পনায় সব সময়েই গোটা ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের স্থান ছিল। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, শক্তিকে নিয়োজিত ক'রে আঘাতকে সসীম করার কথা কোন দিনই আমরা ভাবি নি। চট্টগ্রামের সসীম বিদ্রোহ অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা ও আশার সঞ্চার করে জাতির প্রাণবন্ত যুব সমাজ ও বিপ্লবী সংগঠনকে নূতনভাবে অনুপ্রেরণা দিল। বহু রাজপুরুষ এবার আক্রান্ত ও নিহত হল। এমনকি তাদের দুর্ভেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় সরকারী ভবনের আশ্রয়ও নিরাপদ রইল না। বিনয়-বাদল-দীনেশের দুঃসাহসিক অভিযানে বাংলার সরকারী ভবনের দ্বিতল কামরাতে সুরক্ষিত প্রহরী-বেষ্টিত কারাধ্যক্ষ গুলির আঘাতে নিহত হল। শিক্ষাকেন্দ্রে গভর্নরের প্রাণ নেবার জন্য বাংলার শিক্ষিতা তরুণ যুবতী বিপ্লবী বীণা দাসের প্রচেষ্টা ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার অসমসাহসিকতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। তার পথ অনুসরণ করে শিক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে এবার আবাস কেন্দ্রে, ঘোড়দৌড় মাঠে, হিমালয়ের পাদদেশে আবার যুবক ও যুবতী কর্তৃক অপর এক বিষম প্রচেষ্টা অত্যাচারী লাট এণ্ডারসনের ওপর সংঘটিত হল। প্রাণ নেয়া-দেয়ার প্রচেষ্টায় এবার বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্যর উদ্দেশ্য সফলকাম না হয়ে ফাঁসির মঞ্চে তিনি প্রাণ দিলেন। এমনি করে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা প্রচেষ্টায় সফলে ও বিফলে প্রাণের বিনিময় বাংলার মাটিকে রক্তে রাঙা করে রাখল। ইংরেজ রাজপুরুষদের

দৈনিক মুখপত্রের দুর্নিবার লেখক ও ইংরেজ সওদাগরের মুখ্য অধিনায়ক ওয়াট্‌সন ও ভিলিয়ার্স বিপ্লীদের আঘাতে কেউ চোয়াল হারাল, কেউ প্রাণে মরলেন। ইংরেজ রাজপুরুষ কঠিনতর দুর্ভেদ্য ব্যবস্থা দ্বারা শাসনকে এক ভয়াল মূর্তিতে স্থাপিত করল। সংগঠনহীন জনসাধারণ বৈপ্লবিক কাজে অনগ্রসর রয়ে গেল। সসীম আঘাত তার আপন আপন নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্যত্র অনুপ্রেরণার যোগান দিতে অসমর্থ হল। তদানীন্তন অনুশীলন দলের কর্মীদেব ভাবতে হল কোন্ পন্থায় ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টাকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত ও জনমুখী করে তোলা যায়। সেই আলোচনাব দীর্ঘ গোপন বৈঠকে অনুশীলন সমিতির স্বাধীনতা অর্জনেই প্রাথমিক উদ্দেশ্য স্থির হয় এবং অন্ধকারের অনিশ্চযতার মধ্যে না রেখে তাকে যথোপযুক্ত পাত্রাধারে ভূষিত না করতে পারলে জাতীয় নাড়ীব সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটবে না এবং বিপ্লবমুখী কাজও ফল ফুলে বিস্তার লাভ করবে না। তাই সমাজতন্ত্রের আদর্শ সহিংস স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় যোগসাজসেব পরিকল্পনা রচিত হল। আলিপুর জেলে ও বক্সা শিবিরে বিদ্রোহী বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল।

তদনুযায়ী অনুশীলন দলের সভ্যদের মধ্যে যে কর্মসূচীর সংবাদ বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ সহকর্মীদের কাছে ও দলের যে সব সভ্য বাইরে ছিলেন তাঁদের কাছে গোপনে পাঠান হল। মোটামুটি স্থির হল, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে পুরানো আদর্শের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আমাদের আপাতলক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের উদ্দেশ্য। শুধু বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানই নয়, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের জন্য ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অঙ্গীভূত করতে হবে। কার্যক্রমের আলোচনায় স্থির হল, আমরা

অত্যাচারী শাসকদের পৈশাচিক জুলুমের জবাব দেব। পুলিসের উপর হানা, স্থানীয় বিদ্রোহ প্রভৃতি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করব। সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের সর্বভারতীয় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর দৃঢ় করে সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে।

এই আদর্শ ও নীতিকে কার্যকরী করতে হলে বিভিন্ন বন্দী শিবির, জেলখানা ও অন্তরীণ স্থান থেকে বিশিষ্ট সভ্যদের পালিয়ে যেতে হবে। তদনুযায়ী কয়েকজন বাছাই করা সভ্যের কাছে নির্দেশ পাঠান হল।

অনুশীলন দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তী মহাশয় বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ ছিলেন। দলের নির্দেশ মতো তিনি পালিয়ে কলকাতায় এসে দলের সংগঠনের ভার নেন। অন্তরীণের আদেশ পেয়ে শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত যথা নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝ পথে তিনিও সরে পড়ে কলকাতার দলের কর্মরত সভ্যগণের সঙ্গে যোগদান করে পলাতক জীবন শুরু করলেন। এই সময় দলের পলাতক কর্মীর সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে দলের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখছিলেন।

ছয়

বক্সা শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কালে অনুশীলন দলের যে সভ্যরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বরিশালের শ্রীযতীন রায় (ফেগা রায়), শ্রীধীরেশ রায়, শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শ্রীজিতেন গুপ্ত, শ্রীযশোদা চক্রবর্তী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীরাধিকা কর, শ্রীনরেন দাস, শ্রীঅতীন্দ্রমোহন রায়, বর্তমান লেখক এবং দলের বিশিষ্ট সভ্যদের আরও অনেকে।

প্রেসিডেন্সী জেলে আলোচনা কালে উপস্থিত দলের অন্যতম নেতা শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য বক্সাতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ চাপ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে বক্সা ক্যাম্পে পাঠাতে পারে নি।

পরিকল্পিত কর্মপন্থাকে কার্যকরী করার জন্য বিশেষভাবে যে কয়জনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী ধীরেশ রায়, যশোদা চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ ব্যানার্জি, রাধিকা কর, জীতেন গুপ্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও বর্তমান লেখক। এই সময় বিপ্লবী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়ে যাঁরা দলের সংগঠনকে পেছন থেকে সাহায্য করে আসছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র লাহিড়ী ও দেবেন ঘোষ ছিলেন অন্যতম।

আমাদের প্রধান কাজ ছিল ক'একজন বিশিষ্ট কর্মীকে জেল বা ক্যাম্পের বাইরে পাঠান—যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে পারবেন। অন্তরীণ থেকে পালিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বন্দী-শিবির বা জেল থেকে পালান ছিল দুঃসাধ্য। বিশেষত, বক্সা দুর্গের পারিপার্শ্বিক দুর্গমতা ও প্রাকৃতিক বাধা মানুষের বাধার চেয়েও অনেক দুর্লংঘ্য। শিবিরকে উঁচু কাঁটাতারের ডবল বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। স্থানে স্থানে আবার প্রাচীরও রয়েছে। এই যুগ্ম বেষ্টনীর বাইরে ও ভিতরে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা। শিবিরের অভ্যন্তরে উঁচু **Watch Tower** বা পর্যবেক্ষণ গম্বুজ। সেখান থেকে সব দিকের দূরের ও কাছের সব কিছুই দেখা যায়। এই শিবির থেকে বাইরে যাবার তিনটি ফটক ছিল। দুটি সর্বদা বন্ধ থাকত,—শুধু কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মতো উহা খোলা হত। প্রতিদিনের জন্য খোলা থাকত একটি মাত্র ফটক। সেখানে সশস্ত্র সান্ত্রী দিবারাত্র মোতায়েন থাকত সতর্ক প্রহরায়। ভুটান পাহাড়ের গায়েই বন্দী-শিবির। পর্বতমালার লহরীর পর লহরী মিশেছে দূরান্তরে মেঘের গায়ে। এই পথে একমাত্র ভুটানের অভ্যন্তর দেশেই যাওয়া যায়।

তারপর তিব্বত ও চীনের দুরধিগম্য পথ। ক্যাম্পের দক্ষিণ দিক বেয়ে কোন রাস্তা নেই। সেদিকে পাহাড় সোজা নীচে কোন্ অতলে যেন নেমে গেছে। বহু নীচে পাহাড়ের গহ্বরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাশি রাশি বৃহদাকার গাছগুলো দেখাচ্ছে তৃণ ও গুল্মের মতো। এক এক দিন কুয়াশায় ঢেকে যায় দক্ষিণ দিগন্ত। মনে হয় কুহেলী ঢাকা এই দক্ষিণ দিগন্তে যেন সাগর ছড়িয়ে রয়েছে।

মোটের উপর দেখা গেল উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে কোন স্থান হতেই পালানর পথ বার করা সম্ভব নয়। পশ্চিমের যে ফটকটি সদাসর্বদা বন্ধ থাকত সেটিই বার হবার একটি মাত্র পথ এবং এর উপরেই সশস্ত্র সান্ত্রী দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। অথচ, এই একটি মাত্র পথ ছাড়া আর সব দিকেই পাহাড় গভীর খাদে নেমে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সব জায়গা পর্যবেক্ষণ করে নিরাশ হয়ে আমরা পূবের দিকটায় মনোনিবেশ করলাম।

পূর্বদিকে দুর্বল স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। বন্ধুবর ধীরেশ রায় একটি বিশিষ্ট স্থান দেখে এসে আমাদের খবর দিলেন। উঁচু ডবল তারের বেষ্টনী এক জায়গায় নর্দমার কাছে এসে শিথিল হয়েছে। সেখান দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়—কিন্তু অদূরেই উত্তর দিকে সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। তারই সামনে হাবিলদারের অফিস ও রিজার্ভ বাহিনী মুখোমুখী রয়েছে। হাবিলদারের অফিসের সামনে একদিকে ক্যাম্প অফিস অপর দিকে দোকান, দক্ষিণ দিকে সিপাহীদের ব্যারাক। মনে হয় সব কিছুই যেন বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে। উত্তর দিকে প্রধান ফটকের সিপাহী আর দক্ষিণ দিকে সিপাহী ব্যারাকের গায়ের মধ্যে পালাবার যে পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, তারই অনতিদূরে পনের ফুট উঁচু আর একটি বহিঃপ্রাচীর রয়েছে। সেই প্রাচীরের গায়ে একটি দ্বার, দ্বারটি চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। এই দ্বার ও সংলগ্ন প্রাচীরের উপর কাঁটাতার এলোমেলো ভাবে জড়ান আছে। প্রথমকার কাঁটাতারের বেড়া অতি সতর্কতার সহিত পার হয়ে গেলেও

পুনরায় এই প্রাচীর ডিঙাতে হবে,—তবেই ক্যাম্পের বাইরের রাস্তায় পৌঁছান যাবে। এদিকে ব্যারাকের গা-ঘেঁষে দু'চারটি কুকুরও রাখা হয়েছে, যারা নৈশ প্রহরীর মতো কাজ করে। শুধু শীতের প্রকোপ একটু বেশী হলেই এদের সাড়া শব্দ কম পাওয়া যায়। দূরে—বাইরের তমসাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক বাধার মতো ভিতরের আলোক সমারোহও কম বাধা নয়। সুপ্রচুর বিজলী আলোকিত বক্সা ক্যাম্প। শীতের রাতে গাঢ় কুয়াশায় আলোকগুলোকে কলেরারোগীর চোখের মতো ঘোলাটে দেখা যায়। গাছের ছায়া মায়া জড়িয়েছে, ডবল বেষ্টনীর দুর্বল স্থানটায় সিপাহীর দৃষ্টিপথকে করেছে অস্পষ্ট। বহু অনিশ্চয়তার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আমরা এই স্থানটিকেই বেছে নিলাম।

এই অনিশ্চিত পথযাত্রায় নিশ্চিত বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার জন্য দু'জনের নাম নির্দিষ্ট হল,—জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। জিতেন গুপ্ত দলের পুরাতন সভ্য। অতি নিরিবিলি জীবন যাপনে অভ্যস্ত বলে ক্যাম্পের অধিকাংশ লোকই তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারত না। প্রকৃতিতে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ছিলেন ঠিক বিপরীত। একেবারে মজলিসী লোক। অভিনয়ে হাসি-গল্পে, খেলা-ধূলায় কৃষ্ণপদ সর্বাগ্রগণ্য। তাঁকে ছাড়া আমাদের আসর জমে না। তাঁর চলনে ছিল অপূর্ব রসের মিশ্রণ। তাঁর কৃষ্ণ দেহবর্ণ নামের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছে। নিখুঁত মিশকালো দেহশ্রীর কৌলীন্যে কৃষ্ণপদ ক্যাম্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ও আমাদের এই ধারণা চকিতে বদলাতে হয়েছিল সদ্য আগত মতিবাবুর শুভাগমনে। কৃষ্ণের রং শুধু কৃষ্ণই ছিল। মতিবাবুর ঘনকৃষ্ণ। সবাই কৃষ্ণপদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত,—"দুঃখ কোরনা ভাই, জীবন-সংগ্রামে হারজিত তো আছেই।" চারিদিক থেকে উঠত হাসির উল্লাস-ধ্বনি, কৃষ্ণপদর হাসির শব্দ গগন বিদারী।

সাত

বন্দীশিবিরের আবহাওয়াকে একেবারে নিষ্করুণ মরুভূমি মনে করলে ভুল হবে। এখানে মাঝে মাঝে দু'চারটি পান্থপাদপের সন্ধানও মিলবে। ভূপতিদাকে (শ্রীভূপতি মজুমদার) এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়! তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসব্যঞ্জনা ও সাহিত্যিক ক্ষমতায় ক্যাম্পে একটি রসচক্র স্থাপন করেছিলেন। ক্যাম্পজীবনের একঘেয়ে পরিবেশে ভূপতিদা কত বিচিত্রভাবে সজীবতা সৃষ্টি করতেন। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। বন্দীদের মধ্যে গুণী ব্যক্তির অভাব ছিল না। কেউ কেউ চমৎকার অভিনয় করত। কৃষ্ণপদর ভৃত্যের অভিনয় ছিল অনবদ্য! শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে সুবপতি চক্রবর্তীর আনন্দ পরিবেশন উপভোগ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর নামও স্মরণযোগ্য। সন্তোষ গাঙ্গুলী দেউলী বন্দীশিবিরে আত্মহত্যা করেন।

১৯৩২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী।

শীতের এই রাতে এক মনোজ্ঞ জলসার আয়োজন হচ্ছে। আমরা সেই রাত্রিকে পলায়নের প্রকৃষ্ট সময় বলে সাব্যস্ত করলাম। কেন না প্রধান ফটকের সামনে উত্তর দিকে রাজবন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে আমোদ-প্রমোদ বা কোন হাসির অভিনয় চলতে থাকলে সিপাহীরাও সেদিকে আকৃষ্ট হবে,—তাদের সতর্কতা হবে শিথিল। সেই সময় দক্ষিণ দিকের দুর্বল স্থানের সুযোগ নিয়ে বন্ধুরা পলায়নের চেষ্টাকে সফল করতে পারবেন।

অভিনয়ের দিন ও সময় ঠিক হয়ে গেছে। কয়দিন আগে থেকেই কৃষ্ণপদ অসুস্থতার ভান করে দূরে সরে আছে। জিতেন গুপ্ত সম্বন্ধে কারও কোন ঔৎসুক্য থাকার কথা নয় সাধারণভাবে। কারণ তিনি স্বভাবে গম্ভীর ছিলেন। কৃষ্ণপদ অসুস্থ একথা সবাই জানে। নির্দিষ্ট

দিনে একদিকে অভিনয়ের আনন্দ ও আয়োজন চলছে—অন্যদিকে সন্ধ্যা থেকে চলেছে আমাদের প্রস্তুতি। বক্সার শীত প্রচণ্ড, ক্যাম্পের ভেতর ঘরের মধ্যেও হাড়ে কাঁপুনি ধরে,—ওদের সারারাত বাইরে কাটাতে হবে। প্রয়োজনমতো শীতবস্ত্র সাথে করে নিয়ে কাঁটা-তারের বেড়া ডিঙানো সম্ভব নয়। তাই অতি হাল্কা পোশাক-পরিচ্ছদে দেহকে আঁটসাঁটভাবে আবৃত করে বেড়া ডিঙাতে হবে। একটুখানি শব্দ হলেই গুর্খা সান্ত্রীর গুলির হাত থেকে রেহাই পাবে না। মাথায় পাতলা গরমটুপি, হাতে দস্তানা, গায়ে পাতলা গরমজামা, পরনে জাঙ্গিয়ার উপর ধুতি, পায়ে রবারের জুতো মাত্র সম্বল করে বন্ধুদ্বয় প্রস্তুত হয়ে আমাদের কামরায় এলেন। পলায়নের নির্দিষ্ট স্থানটি থেকে শ্রীধীরেশ রায় ও শ্রীযশোদা চক্রবর্তী ইংগিত করা মাত্র বন্ধুরা রওনা হয়ে গেলেন সবার অলক্ষ্যে। তিনচার মিনিট পরে ধীরেশ রায় এসে উভয়ের নিরাপদে প্রাচীর পার হবার সংবাদ জানালেন। আমরা নিঃশব্দে আপন আপন স্থানে চলে গেলাম। আমাদের আচরণে কোন চাঞ্চল্যের আভাস মাত্রও ছিল না,—কিন্তু বুকের ভিতর ছিল ঝড়ের দোলা। দুঃসাহসী অভিযাত্রী বন্ধুদ্বয়ের যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হোক এই কামনাই বুকের প্রতিটি স্পন্দনে নীরবে উৎসারিত হচ্ছে। রাত্রের প্রহর গুণছি ভোরের জন্য ক্লান্ত প্রতীক্ষায়। গভীর রাত পর্যন্ত জলসার স্থান থেকে হাল্‌কা হাসির হুল্লোড় আমাদের কানে ভেসে আসছিল। বন্ধুদের কেউই তখন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে তাদের দু'জন সহযাত্রী আজ বেড়িয়েছে—বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

ভোরের আলো পূবের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে। কত অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটি মথিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেলাম পলায়নের সেই বিশিষ্ট স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে। বন্ধুরা নিদর্শন রেখে গেছেন—একজোড়া দস্তানা কাঁটাতারের বেড়ার শীর্ষে। শার্ক

হোমস্‌-এর মতো গোয়েন্দার পাল্লায় পড়লে এই দস্তানার সূত্র ধরে পলাতকদের যাবার পথ আবিষ্কার হয়তো সহজ হত।

বন্ধুদের সঙ্গে আবার আমার যখন তাঁদের ধরা পডবার পর সাক্ষাৎ ঘটে, তাঁদের কাছে সেদিনের ঘটনার যে বিবরণ পেয়েছি, এখানে পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করছি। পলায়নের রাতে প্রচণ্ড শীত ও গভীব অন্ধকাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুদ্বয় যে পথ পেয়েছিলেন, সেটি নীচের দিকে নেমে আর একটি পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠেছে। পাহাড়ে উঠেই তাঁরা একটি গাছের উপর চড়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেন। গাছের ডাল থেকে নীচে হিংস্র জন্তুর গতিবিধি লক্ষ্য কবছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের দুর্দান্ত শীতে তাঁদের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে নীচে পড়ে যাবাব উপক্রম হয়েছিল। তাই পববাব ধুতিব একাংশ দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের দেহকে বেঁধে কোনমতে প্রভাতের অপেক্ষায় তাঁরা প্রহর গুণ-ছিলেন। প্রভাতের সূচনায় গাছ থেকে নেমে ক্যাম্পের বাইরের উত্তর পাশের রাস্তা দিয়ে বক্সা-দুয়ার স্টেশনের দিকে তাঁরা রওনা হন। এই পথেব মধ্যেই অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিও তাঁরা সান্ত্রীদের অলক্ষ্যে পেরিয়ে যান। ক্রমাগত হেঁটে যথা সময়ে তাঁরা গাড়ি ধরতে সক্ষম হন।

পলায়নের পরদিন সকাল ৯টা ১০টার সময় অনেক ক্যাম্প-বন্ধু কৃষ্ণপদের খোঁজ নিতে এসে তাকে পেল না। মাদারীপুরের সন্তোষ দত্ত মহাশয় এলেন জিতেন গুপ্তের খোঁজ নিতে, না পেয়ে ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় কে কি আন্দাজ করলেন বলা মুস্কিল। কোন অসংগত কৌতূহল প্রকাশ করা বা আন্দাজ করে এ নিয়ে গাল গল্প করা বিপ্লবী চরিত্রের বিরোধী। দল নির্বিশেষে যে কোন বিপ্লবী বন্ধুর চরিত্রেই এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে। তাই কৃষ্ণপদ বা জিতেন গুপ্তকে ক্যাম্পের মধ্যে খুঁজে না পেয়েও কেউ কোন প্রকার কাণাঘুষো পর্যন্ত সেদিন করেন নি। এমন কি মনের সংশয়টুকু নিবারণের জন্যও সংশ্লিষ্ট দলকে জিজ্ঞেস করেন নি।

পলায়নের দ্বিতীয় দিন বিকাল বেলা, কম্যুনিস্ট দলের সদস্য আব্দুর রেজ্জাক খাঁ (খাঁ সাহেব বলে বিপ্লবীমহলে পরিচিত) একান্তে ডেকে আমায় বললেন,—ক্যাম্পের ক্ষৌরকারের কৃষ্ণপদ ও জিতেন গুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়েছে—স্টেশনের পথে। সে তো তাদের দেখে মহাখুশী। রেজ্জাক সাহেবই তাকে বারণ করে দিয়েছেন যেন একথা ঘুণাক্ষরে আর কারও কাছে সে প্রকাশ না করে। এমনি করেই নিরপেক্ষভাবে বিপ্লবী কর্মীরা একে অন্যকে সহায়তা দান করেছেন। এই সহায়তার পরিমাণ হয়তো সামান্য,—কিন্তু অমূল্য।

বন্ধুদ্বয়েব পলায়নের পর তিনদিন কেটে গেল। শিবির কর্তৃপক্ষ কিছুই জানতে পারে নি। কিন্তু ক্যাম্পের বন্ধুবা সবাই বুঝতে পেরেছেন। নিঃশব্দ সশঙ্ক চিত্তে এর প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছেন সবাই। তখন ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট ছিলেন—কোটাম সাহেব। বিপ্লবী আন্দোলন দমন কল্পে ঢাকার নাগরিকদের উপর বেপরোয়া অত্যাচাব চালিয়ে ইতি-পূর্বে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। আমার অগ্রজ ৺বিমলানন্দ দাশগুপ্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিতানন্দেব গ্রেফতার কালে খানাতল্লাশীর পরোয়ানা দেখতে চাওয়ার "ঔদ্ধত্যের" অপরাধে এই স্বনামধন্য কোটামের হাতেই তাঁরা প্রহৃত হন। বৃদ্ধা মাতাও লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পান নি। কংগ্রেস নেতা ও অনুশীলন সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীণ বয়সেও এই কোটামের যথেচ্ছ লাঞ্ছনার হাত হ'তে অব্যাহতি পান নি। এহেন কোটামকেই বক্সা ক্যাম্পে পাঠান হয় সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করবার জন্য আর তারই আমলে কিনা দু'জন বন্দী পাহাড় জঙ্গলে পরিবেষ্টিত এমনি সুরক্ষিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল!

চারদিন পর। বেলা ১০টায় ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেব সদল-বলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদের থাকবার ব্যারাকে এবং রান্নাঘরে এসে ম্যানেজার শ্রীক্ষিতীশ ব্যানার্জীকে এই দু'জন বন্দীর অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উত্তরে ক্ষিতীশবাবু

জানালেন—"কাল রাত্রে তাদের দেখেছি, এখন কোথায় জানি না।" ক্ষিতীশবাবুর জবাব শুনে কোটাম সদল বলে পলাতকদের থাকবার ব্যারাকে ঢুকে নামমাত্র তল্লাশী করে ক্ষিতীশবাবুকে জানালেন—কিছুক্ষণ আগে এই মর্মে কলকাতা থেকে তারবার্তা এসেছে বন্দী কৃষ্ণপদ ও জিতেন গুপ্ত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তিন চার দিন আগেই তারা ক্যাম্প থেকে অন্তর্ধান করেছে। এই কথা বলে কমাণ্ডাণ্ট পলায়নের সূত্রের সন্ধানে প্রাচীর ও তারের বেড়ার চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন, কিন্তু যে দস্তানা জোড়া কাঁটাতারে আটকে হাওয়ায় উড়ছিল তা তাঁর নজরে পড়ে নাই। অফিসে ফিরে সে প্রধান ফটকের সান্ত্রীদের তলব করে পাঠালেন। তাদের কেউই সন্তোষজনক কিছু বলতে পাবল না। জনৈক অল্পবয়স্ক গুর্খা সিপাহীকে দায়ী করাতে সে জবাব দিয়েছিল —"যব পাকড় যায়েগা তব্ মালুম হোগা। বাবু লোক জরুর সাচ বোলেগা, হামারা সামনেসে ভাগ গিয়া হোগা তো উস্ ওয়াকত বহ লোগ বোলেগা।' এমন জবাবের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংকল্প শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করেন বলে শোনা যায়।

কুখ্যাত কোটাম সাহেব যে এমন চরম আঘাত নীরবে সহ্য করবেন না এটা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। দু'তিন দিন এমনি অনিশ্চিত অবস্থায় কেটে গেল। ইতিমধ্যে কোটাম মনে মনে ফন্দি আঁটছিলেন কি করে বন্দীদের শায়েস্তা করা যায়। তিন দিন বাদেই তাঁর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি প্রকাশ পেতে লাগল। প্রথমেই খাবারের বরাদ্দ টাকা কেটে অর্ধেক করা হল। ক্যাম্পের অভ্যন্তরের কোন অভিযোগই শুনতে তিনি প্রস্তুত নন। ক্যাম্পের ভেতরে সামরিক কায়দায় নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তন করবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। লিখিত কোন অভিযোগের জবাব কেউ পেত না। সহকারী কমাণ্ডাণ্ট লিউলিন, আই. সি. এস্. সবেমাত্র বিলাত থেকে এসে কমাণ্ডাণ্ট কোটামের অধীনে শিক্ষানবিশী করছিলেন। তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। দিনের পর দিন

ক্যাম্পে অভিযোগ জমে উঠতে লাগল। অথচ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ক্যাম্পের ভেতরে না এসে কোটাম সাহেব এখন তাঁর অফিস থেকেই শুধু হুকুম চালাচ্ছিলেন। বার বার তাগিদ দিয়েও বন্দীরা কোন বিষয়ের প্রতিকার পাচ্ছিল না। লিউলিন সাহেবও কোটামের এই প্রকার ব্যবস্থাতে খুশী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমরা কোটাম সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকারের্র দাবী জানালাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন জানতে চাইলেন। উত্তরে জানালাম যে বন্দীদের রাশিকৃত অভিযোগের সুমীমাংসার সদিচ্ছা নিয়েই আমবা কোটাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, বিশেষ কবে তাঁর (লিউলিনের) নিজের যখন কিছুই প্রতিকার করার ক্ষমতা নেই। কোটাম সাহেব সাক্ষাৎ না করায় লিউলিনেব কাছে তাঁকে ভীরু, কাপুরুষ ইংরেজ ও শাসনের একান্ত অযোগ্য অফিসার ইত্যাদি গালমন্দ প্রয়োগ করতেও কসুর করলাম না। আমাদের অভ্যান্তরীণ আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে, যেহেতু ক্যাম্পের অত্যাচার অবিচার এখন ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, স্বাভাবিকভাবে অভিযোগের প্রতিকার সম্ভব হবে না ও শিবিরের ভিতরের খবরও বাইরে পৌছান যাবে না এবং বাইরে থেকে এখানে কারুর আসাও সম্ভব নয় তখন একমাত্র ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হলেই হয়তো বিচারালয়ের মারফত তা বাইরের জগতে পৌছাতে পারে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছালাম যে, কোটাম সাহেবকে আঘাত করতে পারলেই ঐরূপ সম্ভাবনা দেখা দেবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কোটাম সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হলাম ও শেষ পর্যন্ত তিনি সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন। সাক্ষাতের জায়গা তাঁর অফিস ঘর। প্রধান ফটক থেকে বার হয়ে সোজা উত্তর দিকে সামান্য দূরেই অফিস। সিপাহী দর্শনার্থীদের তালিকা অনুযায়ী একজন করে কমাণ্ডাণ্টের অফিস গৃহে যেতে দিল। চার পাঁচজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলেন। আমার আহ্বান

এল। পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট, পায়ে চটি জুতো নিয়ে অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম। ঢুকতেই কমাণ্ডাণ্ট অভিবাদন করলেন। আমিও প্রত্যাভিবাদন করে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার তু'পাশেই তু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। মাঝের বড় টেবিলের অপর পার্শ্বে কোটাম সাহেব হেলান দেওয়া একটি চেয়ারে বসে আছেন। শুভেচ্ছা জানিয়েই সে তাঁর চেয়ারে আবার হেলান দিয়ে বসলেন! ফলে তাঁর মুখখানি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। আমার ডান পাশের কোণে লিউলিন সাহেবের টেবিল। তিনি একমনে হিসাব পরীক্ষা করছেন বলে মনে হল। তু'চারটা কড়া কথা বলে উত্তেজিত করতেই কোটাম সাহেব নিজ চেয়ারে আবার সোজা হয়ে বসলেন। সেই সুযোগে আমি চট্ করে পায়ের চটি খুলে তার গালে ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহীরা আমার গালে, মাথায় ও পিঠে বেদম প্রহার করতে লাগল। বক্তাক্ত হয়ে মুহূর্তমধ্যেই আমি চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়লাম। আমার মাথা ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। কোথায় কিরূপ আঘাত লাগল সঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে আমার বাক্শক্তি রহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাগলাঘন্টি বেজে উঠতেই সিপাহী-সান্ত্রীরা প্রস্তুত হয়ে ছুটে আসছে বুঝতে পারলাম। জুতো খেয়েও কোটাম সাহেব ইংরেজ সুলভ চরিত্রগুণে কর্তব্যবোধ হারায় নি। ক্যাম্প ডাক্তারকে ঔষধ-পত্র সহ অবিলম্বে চলে আসতে নির্দেশ পাঠালেন। ডাক্তার শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (পরবর্তী কালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন) নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঔষধ-পত্র ও যন্ত্রাদি সহ অফিস ঘরে প্রবেশ করেই সযত্নে সেলাই ব্যাণ্ডেজাদি করে আমাকে স্ট্রেচারে উঠালেন (আমাদের কারাজীবনে যে সব সরকারী ডাক্তার ও জেল কর্মচারীদের কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়েছি মাখন বাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম)। ডাক্তার সহ কোটাম ও তাঁর সহকর্মী স্ট্রেচারে আমাকে ব্যারাকে পৌঁছে দেবার জন্য ক্যাম্প গেট পর্যন্ত এলেন—গেটেই বন্ধুরা সকলে ভিড়

করে প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং আমাকে পৌঁছে দিয়ে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ চলে গেল।

পরবর্তী কালে দণ্ডিত অবস্থায় সুদীর্ঘ কারাজীবনে ভারতীয় ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষেব ব্যবহারের তুলনা করে দেখেছি যে, শত্রুর প্রতি ইংরেজদেব কর্তব্যবোধ ও মানবীয় ব্যবহারের পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যেত। সভ্যতাব সাধারণ রীতিনীতি তারা মেনে চলে! সেই সময় অনেক ভাবতীয় অফিসারদের বেলায় এ পরিচয় খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। কোটাম্ সাহেব আহত বন্দীর চিকিৎসার আশু ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নি এবং সহকর্মী সহ আমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ভদ্রতাও দেখিয়েছিলেন।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় নিজেদের ব্যারাকে শুয়ে রইলাম। পরদিন বন্ধুবর শ্রীধীরেন্দ্র মুখার্জীও আবার কোটাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। পূর্বদিনের মতো কোটাম তাঁকেও ডেকে পাঠালেন। পৌঁছাবার সাথে সাথে ধীরেনবাবু বাঁ হাতে তাঁর জুতো কোটাম সাহেবের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন। বন্দীর ডান হাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্বন্ধে সিপাহীদের সতর্ক করে দেওযা হয়েছিল। কিন্তু বাঁ হাতও সমান ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতার সঙ্গে চালাতে সক্ষম এমন কেউ যে এসে উপস্থিত হবেন এ ধারণা বক্সী সিপাহীবা করতে পারেনি বলে ধীরেনবাবু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। বাঁ হাতেব নিক্ষিপ্ত জুতো কোটাম সাহেবের গালে সজোরে আঘাত করল। বলা বাহুল্য ধীরেন বাবুও সিপাহীদের বেপরোয়া আঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। তবে তাঁর গা কেটে রক্ত বেরোয় নি। আহত ধীরেনবাবু ক্লান্ত দেহে বন্দী ব্যারাকে ফিরে এলেন।

শিবিরাধ্যক্ষের উপর পর পর দু'দিন আক্রমণ হল। প্রতিটি আক্রমণের রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার যোগে প্রেরিত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া বাংলার অন্যান্য বন্দী-শিবিরগুলোতেও দেখা গেছে। বক্সার শিবিরাধ্যক্ষ ত বটেই অন্যান্য শিবিরের অধ্যক্ষরাও

অধিকতর সুরক্ষিত অবস্থায় শিবিরের মধ্যে আগমন ও নির্গমন করতে আরম্ভ করল। বক্সা শিবিরে পীড়নের মাত্রা গেল চড়ে, এবং প্রতিশোধমত্ত কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের উপর গুলি চালনা করা যায় কিনা তারই সুযোগ খুঁজছিল।

আট

সেবার মারের ধাক্কা সামলাতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। তারপর আমাকে ও ধীরেনবাবুকে শিবিরাধ্যক্ষকে প্রহারের অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলে বিচারের জন্য পাঠান হল। বিচার প্রকাশ্য বিচারালয়ে হল না—সরকার জলপাইগুড়ি জেলের মধ্যেই বিচারেব ব্যবস্থা করলেন। এই সময় ১৮১৮ সালের ৩ আইনে রাজবন্দী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে দার্জিলিং জেল থেকে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আমাদের মামলা পরিচালনা করবার জন্য তিনি কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন ও শ্রী জে. সি. গুপ্তকে অনুরোধ করে পাঠালেন। এই সময় জলপাইগুড়ি জেলে কংগ্রেস নেতা সর্বশ্রী খগেন দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, শশধর কর ও বীরেন সরকার, বর্ধমানের কালাচাঁদ ব্যানার্জি প্রমুখ রাজবন্দী সেখানে আটক ছিলেন।

প্রথম শুনানীর তারিখ হতেই ব্যারিস্টারদ্বয় উপস্থিত হয়ে মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। মামলা চলতে লাগল। মামলাতে অনেক চমকপ্রদ বিষয় প্রকাশ পেল। কোটাম সাহেবের দুর্ব্যবহারের ফিরিস্তি যা এতকাল সাধারণ্যে অপ্রকাশিত ছিল, এবার মামলার মারফত তা প্রকাশের পথ পেল। ক্যাম্প-কিচেনের ম্যানেজার হিসাবে তাঁর সহিত আমার আচরণ, পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্তের বক্সা শিবির থেকে পলায়নের পর তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কৌশলী ব্যারিস্টারদ্বয়ের জেরার মুখে বেরিয়ে পড়ল।

ঢাকাতে পুলিস সাহেব থাকাকালীন বিপ্লবী-আন্দোলন দমনের নামে কোটাম সাহেব নাগরিকদের উপর কিরূপ অত্যাচার করতেন—তার কুকীর্তির দীর্ঘ ফিরিস্তির কথাও কোর্টে উত্থাপিত হল।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেল থেকে পালিয়ে যাবার এক পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম। অনুশীলন দলের জলপাইগুড়ি জেলা সংগঠনের সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হল এবং সাঙ্কেতিক চিঠিতে কলকাতার ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুদের কাছেও আমাদের পরিকল্পনার সংবাদ দেওয়া হল। সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদের অভিপ্রায় অনুমান করে নিয়ে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চাইলেন। সবদিক চিন্তা করে, বিশেষ করে একজন সম্মানিত নেতার সুনাম ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয় ভেবে, আমরা তাঁর আন্তরিক সাহায্য গ্রহণ করতে রাজী হই নাই। কারণ বৈপ্লবিক কাজ খুব নিখুঁত গোপনীয়তা রক্ষা করেও গোয়েন্দা বিভাগের হাত থেকে রক্ষা পায় না। বহু সংখ্যক গুপ্তচরের সাহায্যে গোপন খবর পাবার ব্যবস্থা তাদের আছে। বিশেষ করে যাঁরা বিপ্লবীদলের কঠোর শিক্ষানবিশীর সুযোগ পান নি, তাঁরা অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাবে কথা গোপন করতে পারতেন না।

ইতিমধ্যে এক দিন দুপুরবেলা একজন জেল-কর্মচারীর মারফত কলকাতার চিঠি ও প্রার্থিত করাত এল। সাঙ্কেতিক চিঠির সাঙ্কেতিক জবাব জলপাইগুড়ির স্থানীয় সংগঠন মারফতও পেলাম।

আমি ও ধীরেনবাবু করাতটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। লোহা-কাটা করাতটির হাতল আছে, আমাদের ঘরের লোহার শিক কাটতে পারা যাবে। এবার শুরু হল জেলের দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান ও পলায়নের অন্যান্য উদ্যোগ কাজ। প্রাচীর-প্রহরীর ব্যবস্থা একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। জলপাইগুড়ি জেলের ভেতরে এক কোণ ঘেঁষে বহিঃপ্রাচীর থেকে বেশী দূর নয় এমন স্থানে রয়েছে সাতটি নির্জন ঘর সারি বেধে। তারই পেছনের স্থানটি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হবে

বলে স্থির হল। খুব শীগগীরই কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাবার সংবাদ বাইরের বন্ধুদের কাছে পাঠান হল, তারা যেন নির্দিষ্ট দিনে যথাযোগ্য সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর শুভেচ্ছা ও মনের আনন্দ জ্ঞাপন করলেন।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একদিন দুপুর বেলা দৌড়ে এসে শুভার্থী জনৈক জেল-কর্মচারী আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিসের নির্দেশে কারাধ্যক্ষ তক্ষুণি আমাদের দু'জনের জিনিসপত্র তল্লাশী করতে আসছেন। গোয়েন্দা-পুলিসের খবর, কলকাতা থেকে একটা লোহা-কাটা করাত জেলে পাঠান হয়েছে এবং তা আমাদের কাছেই নাকি রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষ সিপাহী-সান্ত্রীসহ সদলবলে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেই জোর খানাতল্লাশী শুরু করে দিল। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেও কিছুই আবিষ্কৃত হল না। কর্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে করাতখানা সত্যাগ্রহী হারাণ তাঁর কাছে অন্য কামরায় সরিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনার পর সরকারী মামলা পরিচালনাও ত্বরান্বিত করা হল, খুব তাড়াহুড়ো করে মামলা শেষ হল। আমাদের উপর আড়াই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

এবার শুরু হল আমাদের শায়েস্তা করার পালা। রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আমরা প্রেরিত হলাম কারাদণ্ড ভোগের জন্য। এই জেলে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলাম দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীদের উপর অমানুষিক পীড়ন চলছে। আমাকে ও ধীরেনবাবুকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হল। নিঃসঙ্গ সেলবাসের[১] ব্যবস্থা বেশ নিখুঁত

১। নিঃসঙ্গ সেল (Solitary Cell) সাধারণত শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট। নিঃসঙ্গ সেল-বন্দীর পক্ষে ডিগ্রির অন্ত কোন সেল-বন্দীর সঙ্গেও দিবারাত্রের কোন সময়েই কোন কারণে বা অবস্থায় মেলামেশা নিষিদ্ধ।

ভাবে করা হল। আমাদের দু'জনের মধ্যে দেখাশুনা বা পত্র বিনিময়ের কোন সুযোগই আর রইল না।

১০ নং ডিগ্রি[২] নিঃসঙ্গ সেল[৩] বলে পরিচিত হলেও রাজসাহী জেলকে কতকটা সরগরম করে রেখেছিল। দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত সুরেন্দ্র কর ও অন্য ষড়যন্ত্র মামলার গোপাল বক্সী এই ডিগ্রির দু'টি সেলে আবদ্ধ ছিলেন। চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয়। সাধারণ দণ্ডিত বন্দীর মধ্য হতে এক পাঠান যুবক ছিল এই ডিগ্রিতে। যৌবনে নরহত্যার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড সে লাভ করেছে কিন্তু দশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেও সে মুক্তি পায় নি।

কারণ সে জেলখানায় কারুরই নিকট কখনও মাথা নোয়ায় নি এবং নানা শাস্তি ভোগ স্বীকার করে, এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে বহুবার বীর পাঠানের মতোই জেলখানায় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছে। আমি ডিগ্রির এক নম্বর সেলে এবং গোপাল বক্সী সাত নম্বরে, পাঠান যুবক পাঁচ নম্বরে এবং সুরেন কর আট নম্বর সেলে আবদ্ধ থাকতাম। দশ নম্বর ডিগ্রির জন্য বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। যে ডিগ্রিতে দুরন্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের রাখা হত সেখানে জেলের বাছাই করা পেটোয়া জেল-প্রহরী ও কয়েদী-প্রহরীর দ্বিবিধ কড়া ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজসাহী জেলে জাল ডিগ্রিতে তখন বহু বিপ্লবী বন্দী আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের ওপর সে সময়ে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল।

একটু বর্ণনা না দিলে জাল ডিগ্রি (Cubicle) সম্বন্ধে পাঠকের

২। ডিগ্রি (জেলের চলতি নাম) উপপ্রাচীরে ঘেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেল সমূহের সারি।

৩। সেল (Cell) নিরাপত্তা বা শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট একজন মাত্র বন্দীর বাসের উপযোগী নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ।

সুস্পষ্ট ধারণা হবে না। সাধারণত একটি লম্বা ব্যারাকের মধ্যে লোহার তারের জাল দিয়ে দেয়াল, ছাদ সবই ঘেরা। পাঁচ ফুট উঁচু, ছয় ফুট লম্বা, সারে চার ফুট চওড়া পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট একজন মাত্র কয়েদী থাকতে পারে এমনি ছোট ছোট বহু কোঠা বা সেলের একটি বা দু'টি সারি। দুরন্ত অথবা দাগী স্বভাব-কয়েদীদের (Habitual Prisoners) শাস্তির জন্য এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাত্রে এখানে সাধারণত ঐ জাতীয় কয়েদীদের রাখা হত। কখনও কখনও শাস্তি হিসাবে দিনরাতও কাউকে কাউকে আবদ্ধ থাকতে হত। জালের বেড়াতে কোন আব্রুর ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকটি কোঠায় পৃথক পৃথক দরজা ও তালা লাগানর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক কোঠায় মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা হিসাবে আল্‌কাতরা মাখা একটি করে বাঁশের টুকরিও আছে। এক কোঠার মল মূত্র পাশের কোঠায় অনায়াসেই গড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিবেশে অনেককে হয়তো রাতদিনও কাটাতে হত। কারুর ভাগ্যে কখনও কখনও দীর্ঘ ভোগের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে এবং সেলের মধ্যে নির্দিষ্ট খাটুনীও খাটতে হত। কোঠার স্বাভাবিক উচ্চতা ছিল না। দেহ-সঞ্চালনের জায়গা ছিল না। জাল ডিগ্রির দুর্ভাগাদের অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ই কাল কাটাতে হয়। জেলের নিঃসঙ্গ সেল সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক বিভীষিকা আছে—একান্ত নিঃসঙ্গতার কারণে সেলজীবনও ক্রমে সয়ে যায়, কিন্তু জাল ডিগ্রিতে প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে।

দশ নম্বর ডিগ্রিতে আমরা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থাতেই ছিলাম। অবশ্য নির্যাতনের পাল্লা সেখানেও কম ভারী ছিল না। বাছাই করা যে সব সিপাই ও কয়েদী-প্রহরী মোতায়েন ছিল, তারা কখনও দুর্ব্যবহারের সুযোগ নষ্ট করত না।

রাজসাহী জেলে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলাইয়ের কাজ দেওয়া হল। দৈনিক চব্বিশটি কয়েদী-জাঙ্গিয়ার বড় সেলাই অথবা আঠারটি কুর্তার (জামা) বড় সেলাই নির্দিষ্ট কাজ হিসাবে সমাপ্ত করে

দিতে হত। অনভ্যস্ত হাতে এতটা কাজ করে ওঠা সম্ভব হত না। বিশেষ করে জাঙ্গিয়ার কাজ শক্ত তো ছিলই এবং সময়ের হিসাবে কাজের পরিমাণও বেশী ছিল। পুরা খাটুনি দিতে না পারলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া অতি তুচ্ছ অজুহাতে ত্রুটির জন্য শাস্তির বিধান ছিল। একদিন কারাসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল ফ্লাওয়ারডিউ সাহেব জেল পর্যবেক্ষণ কালে ডিগ্রির পাশে এসে আমাকে সাধারণ কয়েদীর মতো তার সামনে দাঁড়াতে বললে আমি অস্বীকার করি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে আমায় শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সিপাই সাস্ত্রী দিয়ে তার পছন্দ মাফিক কায়দায় সবলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক ধস্তাধস্তি করেও সিপাইরা অকৃতকার্য হলে আমার ওপর এক মাসের জন্য নিঃসঙ্গ সেল বাস ও ডাণ্ডাবেড়িরূপ শাস্তি বিধান করা হল। স্থানীয় কারাধ্যক্ষ লিউক সাহেব অবশ্য এক্ষেত্রে আমার তেমন কোনও দোষ দেখতে পায় নি। কিন্তু বিভাগীয় কর্তার আদেশ তাকে মানতেই হল।

এক মাসের জন্য পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরে আমায় নিঃসঙ্গ সেল বাস করতে হল। কারাবিধান অনুযায়ী নিঃসঙ্গ সেলবন্দীর জন্য সকালে বিকালে দু'বার মোট একঘণ্টা করে বেড়াবার ব্যবস্থা ছিল। আমার সেলের ঠিক সামনেই সম-আয়তনের ছাদবিহীন উপ-সেল ছিল। এই উপ-সেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঙ্গিনাটুকুই আমার নির্দিষ্ট পদচারণের স্থান। নিঃসঙ্গ সেল বাসের ব্যবস্থা অনুসারে আমার সেলটি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তালাবন্ধ থাকত,—নির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া তালা খোলা হত না। সেল থেকে উপ-সেলে পা বাড়ান মাত্রই উপ-সেলের বাইরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে আমি আমার ডিগ্রির বাইরে অন্যান্য বন্দীদের সাথে মেলামেশা বা কথাবার্তা বলতে না পারি। দশ নম্বর ডিগ্রিতে সাধারণত আমি, পাঠান যুবকটি ও অপর দু'জন বিপ্লবী বন্ধু একত্রে সকাল বিকাল পায়চারি করতাম। নিঃসঙ্গ বন্দীত্বের কালে সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন বেলা পাঁচটার সময় আমাব ডিগ্রি খুলতে দেরি হওয়ায় পাঠান যুবকটি সিপাইকে তিবস্কাব করতে থাকে। সেলের ভিতর থেকেই আমি তাব তিবস্কার শুনতে পাই। তালা খুলতে সিপাই অস্বীকার করলে সে সিপাইর হাত থেকে জোর করে চাবিব তোড়া কেড়ে নিয়ে মুহূর্তেব মধ্যে আমাব সেল নিজেই খুলে দিয়ে চাবি সিপাইর হাতে ফেবৎ দিল। সিপাই বিপদ-সূচক বাঁশী বাজাতে উদ্যত হলে পাঠানটি তাকে এই ব'লে সতর্ক কবে দিল যে, সে বাঁশী বাজালে তার নিজ জীবন বিপন্ন হতে পারে বিবেচনায় সে তাকে মেবে নিজে মৃত্যুববণ কববে। পাঠান যুবকটিকে জানত না পুবানো সিপাইদেব মধ্যে এমন কেউ সেখানে ছিল না। তাব কথায ভয় পেয়ে এবং আমাদের হস্তক্ষেপেব ফলে সিপাই বাঁশী বাজান থেকে নিবস্ত হল।

ইতিমধ্যে দশ নম্বব ডিগ্রি থেকে পলাযনের পবিকল্পনা সম্পর্কে পাঠান যুবকের সহিত আলাপ হল। সে তাতে সম্মত হল। হাতল-ছাড়া করাতেব ব্লেড দু'খানা অন্যত্র লুকিয়ে রাখাব ব্যবস্থা কবেছিলাম। সময় বুঝে অতি সঙ্গোপনে ও সতর্কতার সহিত করাত দু'টো আমার সেলে আনিয়ে পবীক্ষা করলাম। অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় ও অযত্নে পড়ে থাকায় ব্লেডে এত বেশী মরচে পড়ে গিয়েছিল যে তা দিয়ে লোহা কাটা যাবে না ভেবে শিক কেটে পলায়নের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল।

কয়েদীদেব প্রতি ভালো ব্যবহারের জন্য একসময় জেল সুপার লিউকেব সুনাম ছিল। বিপ্লবী-আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তাদের প্রতি খুব কড়া ব্যবহারের নির্দেশও আসে। ফলে লিউক সাহেবের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তন দেখা দিল। দমনদলন নীতি প্রয়োগের জন্য রাজসাহী জেল তখন কুখ্যাতি অর্জন করেছে। বিপ্লবী বন্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এই কঠিন অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য তাঁদের অনেকেই লিউক সাহেবের উপর আক্রমণাত্মক প্রতিশোধের পক্ষপাতী

হয়ে উঠলেন। বাইরে থেকেই তখন এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর ছিল। সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থায় জেলের অবস্থা জানিয়ে রাজসাহীর সংগঠনের নিকট একখানা চিঠি গোপনে পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হলাম।

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় সবেমাত্র "লক্-আপ", (Lock-up) হবার আয়োজন হচ্ছিল আমাদের সেলগুলোও বন্ধ করবে এমনি সময় চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রির প্রাচীরের বাইরে থেকে পদ্মার ধার থেকে পর পর কয়েকটি গুলির শব্দ কানে এল। আট নম্বর সেল থেকে বন্ধুবর সুরেন কর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—"বেটা মরেছে" বলে। ইতিমধ্যে বিপদসূচক বাঁশী বাজতে লাগল, জেলের পাগলা ঘন্টিও বেজে উঠল। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই। আধ ঘণ্টা পর সিপাহীদের পাহারার পরিবর্তন হলে জানতে পারলাম যে লিউক সাহেব গুলির আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। সিপাহীরা চোরের মতো নিঃশব্দে পাহারা দিতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে লিউক সাহেব সস্ত্রীক মোটর চালিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ একজন তরুণ বিপ্লবী সাইকেল দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অপর দুই বিপ্লবী বন্ধু গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে আঘাত করেন। গুলি তার মুখে লেগে চোয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে যায়—আঘাত গুরুতর। আহত লিউক সাহেবকে অবিলম্বে স্পেশাল ট্রেন যোগে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাজসাহী জেলের দমন ও দলননীতি সাময়িকভাবে বন্ধ হল। মালিকহীন অবস্থার মতো রাজসাহী জেল স্থানীয় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে চলতে লাগল। জেলের প্রধানের উপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ক্ষুদে শাসকদের উপর স্পষ্ট দেখা গেল। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান ও তাদের মুখে বিভীষিকার কালোছায়া। অন্যদিকে মনের চাপা আনন্দ প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে রাজনৈতিক ও অন্যান্য নিপীড়িত বন্দীদের চোখে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ভাব ফুটে উঠেছে। জেলের আবহাওয়া সাময়িক ভাবে শান্ত হল।

লিউক সাহেবের আততায়ী বলে ধৃত হলেন রাজসাহী অনুশীলন সংগঠনের সভ্য শ্রীভোলানাথ রায়। বিশেষ ট্রাইবুন্যালে বিচারের জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিচারে ভোলানাথ রায়ের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তরের আদেশ হল।

নয়

ঘটনা ও দুর্ঘটনা সবেরই প্রতিক্রিয়া আছে। লিউক সাহেবের প্রাণ হনন প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ না থাকলেও কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল আমরা এই কার্যের প্রেরণাদাতা। কাজেই রাজসাহী জেল থেকে শীঘ্রই আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হলাম। রাজসাহী জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে একমাত্র সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী ও ইংরেজী স্টেট্‌স্‌ম্যান এর সাপ্তাহিক ওভারসীজ সংস্করণ পেতাম। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা তো কোন কাগজই পেতো না। সংবাদপত্র সরবরাহের এই সীমাবদ্ধ ব্যবস্থার উপর সরকারী সেন্সারের কাঁচি যদৃচ্ছ চলে বেড়াত। ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্তনচিহ্ন নিয়ে এই সংবাদপত্র যখন আমাদের হাতে আসত, তখন তাতে দু'চারটি নারী হরণের সংবাদ অথবা সরকারের কোন কার্যের সাফাই ছাড়া আর বিশেষ কিছু সংবাদ থাকত না। দেশীয় রাজনীতি বা কূটনীতির গন্ধযুক্ত বেদেশী সংবাদ যা রয়টার কর্তৃক কৃপণ হস্তে পরিবেশিত হত, সরকারী সেন্সারের কাঁচি থেকে তাও অব্যাহতি পেত না। এমনি করে সংবাদবঞ্চিত ও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে যখন আলিপুর জেলে এলাম, তখন সবিস্ময়ে জানতে ও দেখতে পেলাম ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গেই আমাদের আদৌ পরিচয় ঘটেনি। সেন্সরের কাঁচি সেখানেই সার্থক হয়েছে।

আলিপুর জেল তখন বিপ্লবীদের বাসভূমি। সারা জেলময় তাঁরা নানা পরিবেশে ছড়িয়ে আছেন। সদ্যধৃত হয়ে কেউ হাজতবাস করছেন,

কেউ বা সাজা পেয়ে দণ্ডভোগ করছেন, কেউ বা আন্দামানগামী জাহাজের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আবার কেউ বা আলিপুর জেল হাসপাতালে রোগের চিকিৎসা করাচ্ছেন। অনুশীলন দলের বন্ধুদের মধ্যে সগুধৃত শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তী ও আগরতলা ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত ও বক্সা শিবির থেকে পলাতক শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা হল। কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিস আপত্তিকর জিনিসপত্র এবং সহকর্মীদের সহিত ষড়যন্ত্রের সংশ্রব প্রমাণের উপযোগী কাগজপত্রাদি সহ শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। উক্ত কাগজপত্রের দৌলতে বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে পুলিস অনুশীলন সমিতির বহুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের (**Inter-Provincial Conspiracy**) মামলার সূচনা হল এই থেকে।

তের নম্বর ডিগ্রির এক নিঃসঙ্গ সেলে আমাকে সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছে। সেখানে এক টুকরো কাগজে এল গোপন নির্দেশ—আন্ত-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবার জন্য অপেক্ষমান হৃষীকেশ গুপ্তকে আমারই পাশের সেলে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাকে প্রভাবিত করে তার সংকল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। হৃষীকেশ দেখছিল মুক্তির স্বপ্ন। তার মত পরিবর্তন করান সম্ভব হল না। বরং সেলে বসে তাকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলাম মুক্তির আশায় তার সব কিছু সে পুলিসের কাজেই ব্যবহার করেছে। হৃষীকেশকে আমার আওতা থেকে দূরে রাখবার জন্য আমাকে 'বম্' ইয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হল।

পলায়নের ঝোঁক তখন মাথায়,—অসুস্থতার অজুহাতে 'বম্' ইয়ার্ড থেকে জেল হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতাল তখন বিপ্লবী বন্দীতে জমজমাট। বক্সার পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীও সেখানে আছেন। আগরতলার এক ডাকাতিতে দুই বন্ধুসহ (শচীন্দ্র দত্ত ও পবিত্র পাল) ধরা পড়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে এসেছেন। বর্ধমানের অন্তরীণ স্থান থেকে পলাতক ও পরে কলকাতায় ধৃত শ্রীপ্রভাতচন্দ্র

চক্রবর্তী মহাশয়ও হাসপাতালে আছেন। তাঁর কাছে দলের সংগঠনের বর্তমান অবস্থা জানা গেল,—তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে ধরা পড়লেন তাও বললেন। লিউক-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ভোলা রায় ও চড়পাড়া মামলায় অভিযুক্ত শশী ভট্টাচার্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই দণ্ডভোগ করছিলেন।

জেল হাসপাতালে শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তী সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করলাম। বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইনে দণ্ডিত বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীসুনেত্র সেন তখন হাসপাতালে যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যুগান্তব দলের বিশিষ্ট এবং বিদ্রোহী সভ্য শ্রীফণী দাশগুপ্ত ও শ্রীসুরেন দত্ত পলায়নের পরিকল্পনা নিয়েই হাসপাতালে এসেছেন। শ্রীফণী দাশগুপ্ত বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে বাইরে ফেরারী অবস্থায় ধবা পড়েন। এবং ইতিমধ্যেই তিনি দু'টি মামলায় বত্রিশ বছর কারাদণ্ড লাভ করেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় পনের বছর সাজা নিয়ে সুরেন দত্ত আলিপুব জেলে তখন আছেন।

হাসপাতালে ঘুমিয়ে আছি। বাত্রি দু'টো, চারদিক নিস্তব্ধ। ঘন ঘন সিপাহীব বাঁশী ও পাগলা ঘন্টি বেজে চলেছে। সদলবলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হাসপাতালে এসে হাজির। সাথীসহ ফণী দাশগুপ্তকে নিঃসঙ্গ সেলে বন্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হল। আমাদেব সমস্ত অন্তব বিষাদে ভবে গেল।

ফণীবাবুরা শিক কেটে হাসপাতালের দোতালা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে নীচে নেমে পড়েছিলেন। সেখান থেকে পাঁচিলের দিকে যাবার পথে একটি ঘরে আবদ্ধ কয়েকটা পোষা রাজহাঁস ছিল। মানুষের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে তারা প্যাঁক প্যাঁক করে চীৎকার শুরু করে দিলে লণ্ঠনধাবী দেয়াল-প্রহরী ছুটে এসে তাঁদের দেয়ালের ধারেই দেখে ধরে ফেলে। ফলে এই বিপর্যয়। আমাদেরও পালাবার প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখতে হল।

দশ

কোটাম-মামলার সাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে বিনা বিচারের আটক আইনে স্থানান্তরিত করা হল। বছর চারেক পর আবার সেই পুরানো প্রেসিডেন্সী জেলে এলাম। সেখানে তখন বিপ্লবী বন্দীর সংখ্যা ছিল তিন চার'শ। তা'ছাড়া দণ্ডিত সত্যাগ্রহী বন্দীরাও অনেক ছিলেন।

প্রত্যেক বিপ্লবী দলেরই কেউ না কেউ সেখানে আছেন। অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য তখন প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সাথে সংবাদ বিনিময় হল। বিভিন্ন ক্যাম্পেরও খবর পেলাম। বিভিন্ন ক্যাম্পে ও জেলে তখন দলের দণ্ডিত, বিচারাধীন ও বিনা বিচারে যে সব বন্দী রয়েছেন তাঁদের খবর এবং বাইরে দলের খবর যতটা জানতে পারলাম—সব মিলিয়ে দলের তখনকার অবস্থা মোটামুটি বোঝা গেল। পার্টি তখন গৃহীত কার্যক্রম অনুসারে অগ্রসর হতে প্রস্তুত ও সক্ষম। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আশা ভরসা ও উৎসাহ কিছুটা বেড়ে গেল কারণ সংগঠন ও সাম্প্রতিক দলের নীতি এবং কার্যক্রমের সঙ্গে আমি অধিক পরিচিত ছিলাম।

সভ্যমুক্ত বন্ধুবর শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বাইরের অনুশীলন দলের ফেরারী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়েছিল। কলকাতার সদর কেন্দ্রে তখন ফেরারীদের মধ্যে হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল, পরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ এবং মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতি হাস্যবালা দেবী ও মায়া নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। জিতেন নাহা নামক জনৈক নতুন যুবকের নামও জানতে পারলাম। নোয়াখালীর শ্রীকিশোরী দাশগুপ্ত, এম. এ. পড়ার সময়েই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতার বাইরে সর্বশ্রী প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বক্সা ক্যাম্প থেকে আগত বন্ধুদের নিকট হতে খবরে বুঝতে পারলাম যে, বহু বিশিষ্ট সভ্যের গ্রেফতারের ফলে সংগঠনকে বাঁচিয়ে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য জেল ও ক্যাম্প থেকে অচিরেই বিশিষ্ট বন্ধুদের পালিয়ে বাইরে যাবার পক্ষে বন্ধু মহলে দৃঢ় মত গড়ে উঠেছে এবং পালাবার জন্য তাঁরা ক্যাম্প হতে বিশিষ্ট এক বন্ধুর মারফত এক হাজার টাকার একখানা নোট আমাদের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আটক বন্দীরা নিয়ম অনুসারে যেসব জিনিস পেতেন তার একটা অংশ বাঁচিয়ে এবং গোপনে বিক্রি করে ঐ টাকা তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের উপর অন্তরীণের এক আদেশ এল—যশোহরের কোন গ্রামে তাঁকে নজরবন্দী হবার। সত্যেনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। রাজসাহী কলেজে পড়তেন। কৃতী ছাত্র বলে সেখানে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর বিপ্লবী আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আমাদের কারও কোন সন্দেহ ছিল না, তাঁকে বাইরে পাঠাবার প্রস্তাব করা হলে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। স্থির হল অন্তরীণ স্থান থেকে তিনি পলায়ন করবেন। 'কালজানা' অষুধের একটি খালি কৌটোর গায়ের মোড়ক খুলে তার গায়ে নোটখানি জড়িয়ে দিয়ে মোড়কটি আবার ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য কতগুলি টুকিটাকি জিনিস দিয়ে ভর্তি করা হল। অন্তরীণ স্থানে যাবার দিনে ছোটখাট নানা প্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি আরও কয়েকটি কৌটোর সঙ্গে এই কৌটোটিও ট্রাঙ্কে ভরে দেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে যে টাকা দেওয়া হল এবং কি ভাবে দেওয়া হল তা একমাত্র শ্রীচারুবিকাশ দত্ত, শ্রীপ্রতাপ রক্ষিত মহাশয় এবং লেখক ছাড়া অপর কেউ জানতেন না। যে বন্ধুটি বক্সা ক্যাম্প থেকে গোপনে টাকা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি দলের নিয়মানুযায়ী টাকা পৌঁছে দিয়েই তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এ বিষয়ে তিনিও জানতেন না বা জানবার চেষ্টাও করেন নি। সত্যেনবাবু তাঁর বই, বাক্স, বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। তল্লাশীর সময় জেলফাটকে

কিছুই ধরা পড়েনি। নিরাপদে জেল গেট পার হয়ে গেলেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম। পুলিসের হেপাজতে সত্যেনবাবু যশোহরের পুলিস সাহেবের কাছে উপস্থিত হলে তাঁর বাক্স ও জিনিসপত্র তল্লাশী শুরু হয়। পুলিস সাহেব নিজে সামনে থেকেই তল্লাশী করেন। তিনি নিজেই কৌটোটি বার করে মোড়ক খুলে ফেলে নোটখানি বার করে ফেললেন—সত্যেন বাবুর বুঝতে বাকী রইল না, জেলের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যেই কোনও বিশ্বাসঘাতক রয়েছে যারা ভেতর থেকেই পুলিসকে অতি গোপনে সংবাদটি সরবরাহ করেছে। শ্রীপ্রতাপ রক্ষিত মহাশয় 'কালজানা'র কৌটোটি সত্যেনবাবুকে হাতে দেবার সময় চটের পর্দা ঘেরা দেয়ালের অপর দিক থেকে কোনও এক বিশ্বাসঘাতক দেখে গোয়েন্দা বিভাগে হয়তো পূর্বেই খবর দিয়েছিল।

সত্যেন মজুমদারকে তক্ষুণি গ্রেফতার করে আইনভঙ্গ অপরাধে সাজা দিল এবং পরে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে আলিপুর জেলে পাঠান হল। তাঁর পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ হলেও প্রেসিডেন্সী জেল হতে আমরা পালাবার চেষ্টা করতে থাকি। বাইরের ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় নিয়মিত সাঙ্কেতিক লিপিতে সংবাদ আদান প্রদান চলতে থাকে। সাঙ্কেতিক লিপি লিখতে এবং মর্মোদ্ধার করতে অনেক সময় লেগে যেত কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে তা করতেই হ'ত। আমাদের সাঙ্কেতিক লিপির প্রয়োগ সহজসাধ্য কিন্তু তার "চাবি" জানা না থাকলে মর্মোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কোন একটি অক্ষরের জন্য একটিমাত্র বিশেষ সাঙ্কেতিক সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। যে কোন অক্ষর যে ভাবে যতবারই ব্যবহৃত হোক প্রতিবারেই নতুন নতুন সাঙ্কেতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হ'ত। কোন সাঙ্কেতিক সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহৃত হ'ত না বলে এই সাঙ্কেতিক লিপির মধ্যে বাহ্যতঃ কোন নির্দিষ্ট সূত্র বার করা দুরূহ ছিল—মনে হ'ত কোন সূত্রই যেন নেই তাই সঙ্কেতলিপির পারদর্শীর পক্ষেও সঙ্কেত উদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল।

সঙ্কেতলিপিতে সংখ্যা হিসাবে শুধু ভগ্নাংশই ব্যবহৃত হ'ত এবং একটি ভগ্নাংশ একবারের বেশী ব্যবহৃত হ'ত না। 'a'র সাঙ্কেতিক সংখ্যা $^1/_2$, $^3/_4$, $^5/_8$, $^7/_{50}$, $^3/_{100}$ বা অন্য যে কোন ভগ্নাংশ হতে পারে, b, c, d. প্রভৃতি যে কোন অক্ষর সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা। কোন অক্ষরের কোন্ স্থানে এরূপ কোন্ ভগ্নাংশের প্রয়োগ হবে 'চাবি' বা 'Key' জানা না থাকলে কোন উপায়েই তা বলা যেত না। সাঙ্কেতিক চিঠি লেখা বা বাইরে থেকে আসা সঙ্কেত-লিপি উদ্ধারের ভার আমার ওপরই ছিল। চিঠি বাইরে পাঠাবার এবং বাইরে থেকে চিঠি এলে তা গ্রহণ করার ব্যবস্থার ভার ছিল শ্রীশচীন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর। অন্য দু'একজন বিশিষ্ট সভ্য শচীন-বাবুকে সহায়তা করতেন। শচীন চক্রবর্তী দলের পুরানো সভ্য। দলের অর্থ ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য গোহাটি সংগ্রামে ও দালাণ্ডা হাউসের পলাতক বিপ্লবী ৺প্রবোধ দাশগুপ্তের সাথে নোট জাল করার সময় তিনি ১৯২৫ সালে ঢাকা জেলার কোন গ্রামে গ্রেফতার হন এবং সাত বছরের সাজা পান এবং দণ্ডভোগের শেষের দিকে জেলে তিনি মারাত্মক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। দণ্ডকাল শেষ হলে এই ক্ষয়রোগ নিয়েই তিনি বাইরে আসেন অসহায় আশ্রয়হীন অবস্থায়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সুচিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সাহায্য না পেলে তাঁর এই চিকিৎসা সম্ভবপর হ'ত না।

সঙ্কেতলিপি মারফত জেল হ'তে পলায়নের পরিকল্পনা বাইরে ফেরারী বন্ধুদের আড্ডায় পাঠান হয়। কাঁকুড়গাছি ফেরারী আড্ডায় তখন সর্বশ্রী পরেশ গুহ, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, সুশীল চক্রবর্তী সুধীর ভট্টাচার্য, হাস্যবালা দেবী, মায়া নাগ প্রমুখেরা ছিলেন। এবিষয়ে দু'টি পরিকল্পনা তাঁদের কাছে পাঠান হয়—প্রথমটি ডিনামাইট দিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের প্রাচীরের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশ উড়িয়ে দেওয়া—ঠিক সময় মতো তা করতে পারলে পলায়নের সাফল্য হতাহতের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর ছিল। দ্বিতীয়টি—বিশিষ্ট রকমের

তৈরী একটি রসি-সিঁড়ি (Ropeladder) মোটর গাড়িতে স্থাপন করে জেলের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে আসতে হবে। বাইরে বন্ধুরা তাদেরি গাড়ি থেকে সবুজ আলোর সঙ্কেত দেখাবার পর জেলের ভেতর আবদ্ধ বন্ধুদের থেকে লাল আলোর সঙ্কেত পেলেই প্রাচীর-সংলগ্ন রাস্তা থেকে প্রাচীরের উপর দিয়ে সিঁড়ি জেলের ভেতর এমন ভাবে ফেলতে হবে যাতে সিঁড়ির শেষাংশ প্রাচীর থেকে ভেতরের দিকে আট ফুট দূরে অবস্থিত একতলা দালানের ছাদের ওপর এসে পড়ে। হয় শিক্ কেটে নয় গুণতি ফাঁকি দিয়ে পালানর উদ্দেশ্যে বন্দী বন্ধুরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে একতলার ছাদে উঠে প্রতিক্ষায় থাকবে এবং তখন নিক্ষিপ্ত সিঁড়ির সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে যাবে। বাইরের বন্ধুরা দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে আমাদের চিঠি দিলেন। ডিনামাইট ব্যবহার করা অধিকতর সহজসাধ্য হলেও এবং ডিনামাইট আমাদের সংগৃহীত থাকা সত্ত্বেও—এই পরিকল্পনাতে বহুলোক হতাহত হবার আশঙ্কা বর্তমান ছিল। কাঁকুড়গাছির ফেরারী বন্ধুরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভার নিলেন। আমি ও শ্রীক্ষীরোদ দত্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে বাইরে সঙ্কেতবার্তা পাঠান হল। জেলে আসার আগে শ্রীক্ষীরোদ দত্ত মেদিনীপুর জেলার অনুশীলন দলের কর্মকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনি মেদিনীপুর কলেজে বি. এ. পড়তেন এবং সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন।

এর কিছুদিন আগেই একদিন রাজবন্দীদের ব্যারাকগুলিতে খুব কড়া তল্লাশী হয়ে গেল। তল্লাশীর দল শুধু মোটা দড়ির সন্ধানই বিশেষ করে করেছিল। আমাদের ব্যারাকের ওপরই তল্লাশীর প্রকোপটা ছিল বেশী। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলে তিন'শর অধিক রাজবন্দী ছিল। এর মধ্যে দশবারোজনকে বিভীষণ বলে আমরা বিশেষভাবে সন্দেহ করতাম। এরা নিয়মিত ভাবে বা সুযোগ মতো গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রেখে ভেতরের গোপন সংবাদ সরবরাহ করত। বলা বাহুল্য, দৃশ্যত এরা কোন না কোন বিপ্লবী

দলের সভ্য ছিল। এদের দলের লোকেরাও সাধারণত কোন গোপন সংবাদ তাদেব জানাতেন না। দল নির্বিশেষে বন্দীবা তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। মনে হয এই সব বিভীষণদেব মধ্যে কারুব মনে কোন কাবণে সন্দেহ জেগেছিল যে, আমাদেব মধ্য হতে পালাবার কোনও চেষ্টা চলছে। কি কবে বা কোন্ জায়গা থেকে পালাবাব পরিকল্পনা হচ্ছে তাব বিস্তারিত সংবাদ তাদের জানা ছিল না বলে সম্ভবত দড়ির সাহায্যে পালাবাব চেষ্টা অনুমান করেই গোয়েন্দা বিভাগে তারা খবব দিযেছিল—এক সময়ে অবশ্য এই উদ্দেশ্যে কিছু দড়ি ভিতরে আনাও হয়েছিল, পবে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয।

এগার

নির্দিষ্ট দিনে আমি ও ক্ষীবোদ দত্ত দলীয বন্ধুদের সাহায্যে সন্ধ্যায লক্-আপের সময় সিপাইর দৃষ্টি ও গুণতি এড়িয়ে ব্যারাকেব বাইবে এসে অতি সাবধানে একতলাব দালানের উপবে উঠে উপুব হয়ে শুয়ে বাত্রির প্রতীক্ষায বইলাম।

আমরা একতলা ছাদের উপব শুয়ে সামনেব দোতালা ব্যাবাকেব ছাদের ওপর প্রহবারত বাইফেলধারী সান্ত্রীদেব সন্ধ্যাব গোধূলিতে অস্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেখান থেকে তারা সাবা জেলপ্রাচীর পর্যবেক্ষণ করছে। প্রেসিডেন্সী জেলের পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র (**Watch tower**) তখন রাজবন্দীদেব ব্যারাকের ওপরই ছিল। আমরা একতলার ছাদের গায়ে লেগে শুয়ে রইলাম। রাত্রির প্রথমাংশে অন্ধকার থাকায় এবং একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে ছিলাম বলে পর্যবেক্ষণ-প্রহরী আমাদের অবস্থান বুঝতে পারেনি। ছাদের ওপর কান পেতে ও সতর্ক দৃষ্টিতে সান্ত্রীর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখলাম। নীচের সিপাইদের কথাবার্তাও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাদের ওপর উপুর হয়ে বুকে হেঁটে শম্বুক গতিতে প্রতি ক্ষেপে দু'তিন আঙ্গুল করে প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে আমরা

অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং এভাবে প্রায় দেড়শ ফুট যেতে হলে, সেখানে পৌঁছোতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে যাবে। এর মধ্যে আঁধার কেটে জ্যোৎস্নার আলোক দেখা যাবে এবং আমাদের উদ্দিষ্ট কার্যে ব্যাঘাত হবে। কিন্তু এই অবস্থায় তাড়াহুড়া করে চলতে গেলেও পর্যবেক্ষণ প্রহরীর দৃষ্টি এড়ান কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ চলন্ত বস্তুর ওপর তাদের নজর পড়াব আশঙ্কা বাড়বে। তাই আমরা বুকে হাঁটার গতিবেগ বাড়াতে পারিনি। এ ভাবে চলে আমরা অনুমান ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। এখন বাইরের ফেরারী বন্ধুদের মোটর গাড়ি হতে সবুজ রঙের আলো আকাশের গায় পড়ামাত্র ব্যারাকের বন্ধুরাও লাল আলোর সংকেত ক'রে উভয় পক্ষকেই প্রস্তুতির নির্দেশ দেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও আকাশের গায়ে সবুজ আলোর কোন সঙ্কেত আমাদের নজরে পড়ল না। একবার শুধু সবুজ রঙের এক ঝলক আলো দেখতে পেলাম বলে মনে হল, কিন্তু তারপর তার আর পুনরাবৃত্তি হল না। জবাবে লাল আলোর সঙ্কেতও দেখা গেল না। এ ভাবে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় রাত দুটো পর্যন্ত ছাদের ওপর একই অবস্থায় আমরা পড়ে রইলাম। উপুর হয়ে ছাদের ওপর কান রেখে নিশ্চল অবস্থায় নিঃশব্দে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে শুধু ইসারায় ইংগীতে ভাব বিনিময় হচ্ছিল। রাত দুটোর পর আর প্রতীক্ষা না করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করে ক্লান্ত দেহে উভয়ে ফিরে চললাম।

যাবার সময় যে সহজ ভাবে চলেছিলাম ফিরতি পথে কিন্তু সেরকম ধীর ও দৃঢ় ভাবে বুকে ভর করে চলা দায় হল। অবসন্ন দেহ যেন আর টেনে বয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে জোর করে দেহটা টেনে টেনে চলতে চেষ্টা করছিলাম। তখন আর যেন শরীরটাকে ছাদের ওপর নিশ্চল স্থির রাখতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে একটু আধটু দেহ টানবার শব্দও হচ্ছিল। কিছুদূর চলার

পরই সামনে পড়ল একতলার ছাদের ওপর মাঝখানে টিনের ছাউনি দিয়ে একটি বড় বায়ু-নিকাশী (ventilator)। বায়ু-নিকাশীর নীচের জায়গাটুকুতেই শুধু শিক লাগান ছিল, ছাউনির নীচ দিয়ে দেহটিকে টেনে নিতে হবে। যাবার পথে অতি সহজেই মাথা গলিয়ে শিকের উপর ভর করে চলে গিয়েছিলাম, কোন কষ্ট হয়নি। কিন্তু ফিরতি পথে দেখা গেল মাথা গলিয়ে শিকের উপর ভর করে হাতের জোরে আর দেহকে টানতে পারছি না, তাই খানিকটা জোর পায়ের উপর পড়ল। ফলে দেহ একটু উঁচুতে উঠে যেতেই ওপরের টিনের গায়ে একটা ধাক্কা লেগে গেল—নিশার নিস্তব্ধতা ভেদ করে প্রচণ্ড শব্দ হল। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা উভয়েই টিনের নীচে সেই অবস্থাতেই চুপ করে রইলাম, শব্দ শুনেই নীচের লণ্ঠনধারী সিপাই 'ক্যা হ্যায় ?' 'ক্যা হ্যায়' ? বলতে বলতে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এল। আরও দু'তিন জন সিপাই তাকে অনুসরণ করল, ছাদের সান্ত্রীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য আসতে পারে ভেবে নিশ্চল হয়ে চুপটি করে পড়ে থেকে ভাবছি এই বুঝি বাঁশী বাজল। ইত্যবসরে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটল। বায়ু-নিকাশীর নীচে চেঁচামেচি শুনে এবং আলোর শোভাযাত্রা দেখে ভয় পেয়ে মিউমিউ করতে করতে একটি বিড়াল হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে নীচে সিপাইদের সামনে পড়ল। শব্দের সঙ্গে বিড়ালের কার্যকরণ সম্পর্ক স্থাপন করে সিপাইরা তাদের অভ্যাসসুলভ ভাষায় বিড়ালটার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী চোস্ত গালি দিতে দিতে চলে গেল।

আমরা তখন আবার বুকে হাঁটা শুরু করলাম। রাত চারটে, সাড়ে চারটের সময় আমাদের গন্তব্যস্থানে, অর্থাৎ ছাদের এক কোণে ফিরে এলাম। কিন্তু তখনও ছাদ থেকে নামলাম না—আঁধার কাটেনি। সূর্যোদয়ের পূর্বে "লক্-আপ" খোলার সময় নীচে নামব বলে আমরা ঠিক করলাম। কারণ ঐ সময় ব্যারাকের বন্ধুরা আমাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসতে পারবে এবং হট্টগোলের ভেতর সিপাইরাও আমাদের আলাদা করে দেখবার বা বুঝবার সুযোগ পাবে না।

ছাদের কোণে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই কখন যে আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তা টেরও পেলাম না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বন্ধুবর ক্ষীরোদ দত্ত সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিলেন। ঘুম ভাঙ্গলে আকাশের দিকে চাইতে বুঝতে পারলাম, নামবার সময় হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমরা উভয়েই ছাদের কোণের দিক দিয়ে নীচে নেমে পড়লাম। ব্যারাক খুলতে তখন দশ পনের মিনিট আরও দেরি হবে। এই সময়টুকু সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য পায়খানার সারিগুলির মধ্যে আমরা দু'জনে পাশাপাশি দুটো পায়খানায় ঢুকে পড়লাম। হিন্দুস্থানী সিপাইর দল ভোরে ব্যারাক খোলার আগেই আমাদের সামনেই আশপাশের পায়খানায় ঢুকে নিত্যকার্য সেরে বার হয়ে গেল, তারা আমাদের অবস্থান বুঝতে পারল না। ইত্যবসরে ব্যারাক খোলার আওয়াজ কানে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরা ছুটে নীচে নেমে এসে আমাদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল ও তাদের সাথে সাথে আমরাও উপরের ব্যারাকে চলে এলাম। আমাদের দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত এবং সর্বাঙ্গে ও ধুতি জামায় শ্যাওলা ও কাদামাটি মেখে আমরা ভূত সেজেছি। তার ওপর মুখে শ্যাওলার পুরু দাগ পড়েছে, হাত পা অত্যন্ত মলিন এবং এত সব চিহ্ন সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। কিন্তু তাদের নজরে পড়বার আগেই বন্ধুরা আ-াদের ঘিরে রেখে উপরে ব্যারাকে নিয়ে চলে গেল। সেখানে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকে সর্বাঙ্গ জামা কাপড় ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এলাম। এমনি করে সেই নৈশ অভিযানের অবসান ঘটল। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাইরের ফেরারী বন্ধুরা কেন নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হতে পারেন নাই জানবার জন্য বাইরে সঙ্কেতলিপি পাঠালাম। জবাব আর পেলাম না। পরবর্তীকালে শ্রীহরিপদ দে ও শ্রীঅমূল্য সেন গ্রেফতার হয়ে যখন জেলে এলেন তখন তাঁদের কাছে জানা গেল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই বিপর্যয় দেখা দিতে লাগল এবং পলতার বাসায় দুইজন ফেরারী

কর্মী শ্রীখগেন্দ্র ব্যানার্জী ও শ্রীনরেন সরকার ধৃত হন। এতে হরিপদ দে ও অন্যান্য বন্ধুদের জিতেন নাহা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

প্রেসিডেন্সী জেলের অপারেশনের নেতৃত্ব করবার ভার নিয়েছিলেন অমূল্য সেন ও তাঁর সাথী মনোজ রায়। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে জেল প্রাচীর প্রহরার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তাঁরা অধিকতর প্রহরার ব্যবস্থা ছাড়াও দেওয়ালের উপর টর্চ লাইট স্থাপন ও সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন দেখতে পেয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং উক্ত সংবাদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করেও পাঠাতে পারেন নি।

তাঁরা অচিরেই কাঁকুড়গাছির ফেরারী আড্ডায় পুলিসের নজর পড়তে দেখে সকলেই—হরিপদ দে, পরেশ গুহ, নিরঞ্জন ঘোষাল, সীতানাথ দে, সুধীর ভট্টাচার্য, হাস্যবালা দেবী, মায়া নাগ তড়িঘড়ি বাসা ছেড়ে চলে যান। পুলিসও অল্পকাল পরেই হানা দিয়ে সেখানে রান্না করা গরম ভাত, ডাল, তরকারিসহ পরিকল্পনার অন্তর্গত রসি-সিঁড়ি (Rope ladder) ও সাঙ্কেতিক আলোর ব্যবস্থার মাল-মসলাদি পায়। কিন্তু কাউকে তারা সেখানে ধরতে পারে নি।

ইতিমধ্যে জিতেন নাহা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী জেলে এল এবং আমাদের সঙ্গেই বাস করছিল। দলের সভ্য হলেও এর কোন বৈপ্লবিক পরিচিতি পূর্বে ছিল না। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থার কিছুটা দায়িত্ব বাইরের বন্ধুরা জিতেন নাহার উপর দিয়েছিল। বাইরের উদ্যোগ-পর্বের প্রধান অংশের ভার নিয়েছিলেন শ্রীহরিপদ দে। জেলের ভেতরে এসেই জিতেন নাহা জানাল হরিপদ দে, পরেশ গুহ ও নিরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখের সঙ্গে তার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রেসিডেন্সী জেলের কোন্ স্থান হতে কি ভাবে পালাবার পরিকল্পনা হয়েছে, সে বিষয়ে জিতেন নাহা জানতে চাইলে আমাদের ব্যারাক থেকে বহুদূরে একটি স্থানের কথা বলি, যা কার্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না; তাতে সে সংশয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বিষয়ান্তরে

আলাপ শুরু করে দিল। ফেরারী আসামী হয়েও গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই জিতেন নাহাকে রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্রে রাখা হয়েছিল বলে আমাদের মনে স্বভাবতই সন্দেহ জেগেছিল যে, এতে পুলিসের কোনও গোপন হস্ত রয়েছে। সাধারণত কোন ফেরারী বিপ্লবী গ্রেফতার হয়ে জেলে এলে তাকে কিছুকালের জন্য অন্যদের সম্পর্ক থেকে আলাদা করে রাখা হত যাতে তার উপর অথবা তার সাহায্যে কোন মামলা দায়ের করা যায় কিনা তারই অপেক্ষায়—বিশেষ করে যে সময়ে আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা পাকাবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল, সে সময়ে জিতেন নাহাকে সরাসরি রাজবন্দীদের ব্যারাকে এক সঙ্গে রাখা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলের সহিতও যোগাযোগ ছিল। আমাদের সঙ্কেতলিপির আদান প্রদানও চলত। হঠাৎ কখনও কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লেও যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়, অথবা সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং সঙ্কেত উদ্ধার করাও কঠিনতর হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে সঙ্কেতলিপি লিখে দিতাম অদৃশ্য কালিতে। বন্ধুরা নির্দিষ্ট অদৃশ্য কালিতে লেখা পাঠোদ্ধারের সঙ্কেত ফরমুলা জানতেন। জিতেন নাহার গ্রেফতারের কয়েকদিন পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তীর একখানা সঙ্কেতলিপি আমাদের নিকট পৌঁছলে আমরা জানতে পারি যে, জিতেন নাহার পক্ষে ঐ ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় রাজসাক্ষী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং দলের খবর সংগ্রহ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গোয়েন্দা বিভাগ তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্রে রেখেছে। তার সম্বন্ধে উপযুক্ত "ব্যবস্থা" করার বিষয়, লিপিতে লেখা ছিল। চিঠিখানা মাদারীপুরের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যুগান্তর দলের শ্রীসন্তোষ দত্তের মারফত পেয়েছিলাম। অদৃশ্য কালিতে লেখা আরও একখানা চিঠি চট্টগ্রামের শ্রীনগেন সেন (জুলু সেন নামেই তিনি

রাজনৈতিক বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন) মহাশয়ের মারফত এসে পৌঁছাল।

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে তখন আর পালাবার চেষ্টা করা সম্ভব নয় কারণ সেখান থেকে আমাদের দেউলী বন্দীনিবাসে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দেউলীতে পাঁচশো বন্দীকে রাখবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং শ' খানেক বন্দীকে সেখানে ইতিমধ্যে পাঠানও হয়েছে।

বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে দেশীয় রাজ্যমণ্ডলীর অন্তর্গত চীফ-কমিশনার শাসিত প্রদেশ রাজস্থানের থর মরুভূমি পার হয়ে রাজপুতানার এক প্রান্তে, আজমীর হয়ে দেউলী বন্দীনিবাস যেতে হয়। দেউলী পূর্বে ছিল, ব্রিটিশ সেনা নিবাসের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশ বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় ও পরিবেশে সরগরম। বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বাংলা দেশ ইংরেজের সঙ্গে নানাভাবে সংগ্রামে লিপ্ত। বঙ্গভঙ্গ ও ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের আন্দোলন থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপের সহিত বাংলা সুপরিচিত। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও বিপ্লব আন্দোলন বাংলার মতো দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও রাজস্থানের মরুভূমিতে বিপ্লব আন্দোলনের স্রোত তখনও পৌঁছাতে পারেনি। দু'চারটি যুবক বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেও সেখানে এমন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি যার ফলে সে অঞ্চলে কোথাও কোন বন্দীনিবাস স্থাপন করলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কোনও পরিবর্তন ঘটতে পারে। বঙ্গোপসাগর মধ্যবর্তী দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের জন্য যেমন আন্দামান বন্দীশালা বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল, তেমনি একই উদ্দেশ্যে দেউলী বন্দীনিবাসও তৈরি হল। বক্সা, হিজলী ও বহরমপুর বন্দীনিবাসগুলি বাংলার অভ্যন্তরে—বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে এবং সেখান থেকে বিপ্লবীরা গোপন পথে সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে বৈপ্লবিক কাজ করতে সমর্থ বলে শাসকবর্গ মনে

করত—তাই বিপ্লব আন্দোলনকে রাজবন্দীদের সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই শাসকবর্গের এই চক্রান্ত।

বার

দেউলী যাত্রীদের জন্য সরকারী অর্ডার অনেকের এসে গেছে। সন্ধ্যার সময় সাবেকী আমলের অনুকুল দা (অনুকুল মুখার্জি) অর্ডার পত্রখানা উল্টিয়ে ধরে রহস্য করে বললেন, "দেখো, আমি দেউলী যাব কিনা সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মতামত জিজ্ঞেস করেছে। অনুকুল মুখার্জির মত না হলে তাকে পাঠায় কার সাধ্য ?" "অনুকুলদার অভিমত না নিয়ে তো আমাদেরও পাঠাতে পারবে না" পাল্টা পরিহাস ছলে তাঁকে এ জবাব দেই। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাবতে লাগলাম—দেউলীর পথে পালাবার কোন পরিকল্পনা করা যায় কিনা। আমরা থাকব রিজার্ভ গাড়িতে, সশস্ত্র সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত। মধ্যবর্তী কোন স্টেশনে নামা-ওঠাও চলবে না। একমাত্র গাড়ি বদল হবে আগ্রায়। আগ্রা বাংলা থেকে বহুদূরে। এরূপ যখন অবস্থা—তখন পালাবার কোন সার্থক পরিকল্পনা করতে হলে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীর সাথে লড়বার সামর্থ্য নিয়েই করতে হবে। আমরা তখন বেপরোয়া, বাইরে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আঘাত হানবার জন্য পাগল। অবস্থা যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, তার সম্মুখীন হতে সব সময়ই প্রস্তুত। বাইরে ফেরারী বন্ধুদের কাছে এক পরিকল্পনা পাঠালাম। তাঁদের অনুমোদন ও সমর্থন পেলে পথে খণ্ডযুদ্ধ করে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করব।

আমরা এভাবে পালাবার এক পরিকল্পনা করে বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম। রাত্রিতে পথের মাঝে শিকল টেনে গাড়ি থামিয়ে আমরা লাফিয়ে বাইরে পড়ব। তারপর রক্ষী পুলিসদলকে অতর্কিত আক্রমণে অভিভূত ও পঙ্গু করে ধুম্রজালের আড়ালে অপেক্ষমান মোটরে সরে

পড়ব। একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে আবশ্যকমতো অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সহ মোটর গাড়ি নিয়ে বন্ধুরা উপস্থিত থাকবে। বাইরের আলোর নিশানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকেও অনুরূপ আলো দেখান হবে। এভাবে আলোর সঙ্কেতের মারফত উভয় পক্ষের প্রস্তুতি পরস্পরকে জানাবার ব্যবস্থা ছিল। যাত্রার দিন পূর্বাহ্নেই জেল থেকে বাইরের বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। হাওড়া স্টেশনে সেই একই গাড়িতে কিন্তু ভিন্ন কামরায় অনুসরণকারী সহায়ক বন্ধুদের যাবার জন্যও লিখে জানিয়েছিলাম।

বাইরের বন্ধুদের কাছে পালাবার পরিকল্পনা পাঠাবার কিছুদিন পরেই দেউলী যাত্রাব নির্দেশ এল। ইতিমধ্যে জনৈক বন্ধুব মারফত সংবাদ পেলাম যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিস একটি ফেবারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করার জন্য কলকাতার এক বাসায় দুই এক দিনের মধ্যেই হানা দেবে। ফেরারী বিপ্লবীর নাম ও বাসার ঠিকানাসহ খবরটি জরুরী সঙ্কেতলিপির মারফত অবিলম্বে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, তিন দিন পর ফেরারী বন্ধু অমূল্য সেন উক্ত ঠিকানায় প্রেরিত সঙ্কেতলিপিসহ ধরা পড়েছেন। কারণ সঙ্কেতপলিপি উদ্ধারকারী কারো সঙ্গে তাঁর তখন পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি। সঙ্কেত উদ্ধারকারীরা হয় ধরা পড়েছে, নয় অন্যত্র চলে গেছে।

দেউলী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নেতা শ্রীপ্রতাপ রক্ষিত মহাশয় এতকাল দলের গোপন বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সঙ্কেতলিপির সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ বা আপত্তিকর চিঠিপত্র যাতে না থাকে, সেজন্য আমার ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ তল্লাশী করে দেখার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই একখানা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেতলিপি বাইরে পাঠাবার সময় ধরা পড়ে যায়। চিঠিখানা নানা খবরে ভর্তি ছিল। সুখের বিষয় গোয়েন্দাবিভাগ সঙ্কেতলিপিখানার পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। অনেক সময়

সঙ্কেতলিপি লেখা হয়ে গেলেও সুযোগের অভাবে বাইরে পাঠান সম্ভব হত না। নিরাপত্তার জন্য সুটকেশ বা বাক্সের মধ্যে এমন সংগোপনে রাখতে হত যে, কয়েকদিন পরে নিজেরাই খুঁজে পেতাম না, অথবা উহা মনে থাকত না। এভাবে দু'এক খানা আপত্তিকর লিপি বাক্সের তলায় বা কোণে পড়ে থাকা অসম্ভব নয় তাই এই সতর্কতা।

দেউলী যাত্রার দিন হাওড়া স্টেশনে এসে উৎসুক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম—নির্দিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত কাউকে দেখা যায় কিনা। গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাউকে দেখতে পেলাম না। বাংলার এলাকার প্রতিটি স্টেশনে সজাগ দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও আশাপূর্ণ কোন কিছু নজরে পড়ল না। বাংলার বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো একেবারেই নিভে গেল। অনুসন্ধানী দৃষ্টির আর কোন কারণ বা অর্থই রইল না। আগ্রায় গাড়ি বদল করতে হল। শেষ স্টেশনে নেমে মরুপথে সুদীর্ঘ আশি মাইল মোটরে যেতে হল, পথে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী। চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মরু-প্রান্তর। তারি মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই পথ। মাঝে মাঝে মরুদ্যান ও প্রাচীর-ঘেরা ছোট ছোট পল্লী. আর তার চারপাশে সামান্য চাষের জমিতে চাষবাসও দেখা যায়। আবার সেই সীমাহীন মরুভূমি। মরুপথের দু'ধারে মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল স্বচ্ছন্দে চড়ে বেড়াচ্ছে,—সঙ্গে দু'চার জন মেষপালও আছে। ঐ মরুপথের মাঝে মাঝে কলকাতার শ্রেষ্ঠীদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—জনগণের রক্তশোষক মালিকদের জমক ও দেমাকের প্রাণহীন উদ্ধত পরিচয়স্বরূপ। কলকাতা ও ভারতের ধনিক কুলোত্তম শ্রেষ্ঠীদের পিতৃভূমি এই রাজস্থান। কিন্তু এদের দৌলতে এতটুকু লাভবান হয়ে ওঠেনি এই মরুরাজ্য। স্কুল, কলেজ, রুগ্ন-সদন, পল্লী-সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, পশু-সদন ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মরুভূমির বুকে প্রাণ

সঞ্চার করে দেবার, তাকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলবার কোন প্রচেষ্টারই পরিচয় চোখে পড়েনি। মাড়োয়ারী ধনী বণিক তার শোষণলব্ধ অর্থের ভগ্নাংশ বিশেষ দু'চারটে মন্দির ও ধর্মশালা খুলে ধর্মের ঘরে ফাঁকি দিয়ে ইহলোকে দৈহিক সুখ-বিলাস ও পরলোকে স্বর্গবাসের সহজ ব্যবস্থা করে রেখেছে মাত্র।

প্রেসিডেন্সী জেল ছাড়ার দু'দিন পর বিকাল চারটার সময় দেউলী শিবিরে এসে পৌঁছোলাম। শিবিরে ঢুকতেই শুরু হল তল্লাশীর পালা—একদিকে ডাক্তারের তল্লাশী চলছে, দুইজন বিশিষ্ট ডাক্তার—কেউই এম-বি. বি. এস-এর নীচে নয়, পরীক্ষা করছেন বন্দীদের উলঙ্গ করে। উলঙ্গ করে পরীক্ষা করার অধিকার নাকি একমাত্র এম্-বি. বি. এস ডিগ্রিধারী ডাক্তারদেরই আছে। লজ্জা সংকোচের বালাই তাঁদের নেই। অন্যদিকে বাক্স বিছানা প্রভৃতি জোর তল্লাশী শুরু করে দিয়েছেন কমাণ্ডাণ্ট বা শিবিরাধ্যক্ষ মিঃ ফিনি সাহেব যিনি পূর্ব পরিচিত, বক্সা শিবিরের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। সরকারের কাছে এঁর যথেষ্ট কদর। তাই দেউলী শিবির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিনি সাহেবকে অধ্যক্ষ করে সেখানে পাঠান হয়েছে। তিনি নিজেই আমার বাক্স তল্লাশী শুরু করলেন। শুরু করেই একটুকরো লেখা কাগজ অতি সহজে খুঁজে পেয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন। দুটো চোখ তার হিংস্র আগ্রহে চক্‌চক্‌ করছে। চোখে তখন আমার চশমা ছিল না, তবুও বেশ বুঝতে পারলাম, টুকরো কাগজটুকুতে ছিল সঙ্কেতলিপিতে রূপান্তরিত করার পূর্বে সরল ইংরেজীতে লেখা দলের সংবাদের খসড়া, কি করে যে এই চিরকুট বাক্সে রয়ে গেল এবং কি করেই যে বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাওয়া গেল তা বুঝতেই পারলাম না। কারণ যাত্রার পূর্বে আমি ও প্রতাপবাবু উভয়ে যথেষ্ট তল্লাশী করেছিলাম, তাই আবার বিভীষণদের কথা মনে এল। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে যে, কোন সময়ে কোন বিশেষ সংবাদ বাইরে পাঠাবার জরুরী তাগিদে তাড়াহুড়া করে খসড়া রচনা করে ও সঙ্কেতলিপি শেষ করে তখনই

বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হওয়ায় চিরকুটটি নষ্ট করা হয়ত সম্ভবপর হয়নি। তাই নিরাপত্তার খাতিরে ও যাতে সহজে কারও চোখে পড়তে না পারে তার জন্য সংগোপনে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, পরে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হবে বলে কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে ও ঝামেলায় তাকে নষ্ট করার কথা মনে ছিল না। বলা বাহুল্য এ জাতীয় আপত্তিকর কাগজপত্র সাধারণত টুকরো টুকরো করে যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া নিরাপদ নয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করেই দিতে হয়, যাতে পরে কখনও কোনও সন্ধানী চক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনাটুকু না থাকে। কারণ টুকরো টুকরো কাগজ জোড়া দিয়ে এমনকি পোড়া কাগজ থেকেও লিপি-বিশারদরা অনেক ক্ষেত্রে লিপির মর্ম উদ্ধার করেছেন। যাই হোক, ফিনি সাহেবের হাতে আপত্তিকর কাগজের টুকরো দেখামাত্র তাঁর হাত থেকে চিঠিখানা ফস্ করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই চতুর ফিনি সাহেব মুচ্‌কি হেসে নিঃশব্দে চিঠিখানা নিয়ে দ্রুত অফিস ঘরে চলে গেলেন। তিনি সম্ভবত পরবর্তী ডাকেই কলকাতার সদর গোয়েন্দা অফিসে কাগজটুকু পাঠিয়ে দিলেন।

দেউলী পেঁছোবার পরদিনই আমার পেটে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, ডাক্তারেরা সেটাকে এপেণ্ডিসাইটস্ বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং অবিলম্বে অপারেশনের প্রয়োজন মনে করায় সেইদিনই আমাকে মোটরে করে আজমীড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। হাসপাতালে পেঁছানমাত্র অপারেশন করা হয়। পরের দিন রোগ শয্যায় শুয়ে, তখনও ভাল করে জ্ঞান হয়নি এ অবস্থায় শ্রদ্ধেয় জে. এম. সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হাসপাতালের এক সহৃদয় হিন্দুস্থানী ডাক্তার সংবাদটি গোপনে জানিয়ে গেলেন।

বাংলার ও ভারতের এক বিশিষ্ট জননেতা চলে গেলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে সেনগুপ্তের নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত

ছিল। তার অভাব যেন সমগ্র সত্তার মধ্যে অনুভব করলাম। অস্ত্রোপচারের বেদনা মর্মের বেদনায় রূপান্তরিত হল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সেনগুপ্তের কাছে বহু বিষয়ে ঋণী। ১৯২১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সুযোগ্য সহকারী হিসাবেও আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে দীর্ঘ ধর্মঘট চালিয়ে রেল চলাচল ব্যাহত করে দিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার ত্রি-নেতৃত্ব, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি, কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের নেতা এবং কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব ভার তাঁর উপর পড়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সে সব ভার বহুদিন বহন করেছেন। বাংলার বিপ্লবী সংগঠনও তাঁর কাছে অনেক বিষয় ঋণী ছিল। কৌঁসুলী হিসাবে চট্টগ্রাম রেলওযে ডাকাতি ও চট্টগ্রামের গোয়েন্দা অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত বিপ্লবী আসামীদের পক্ষ সাহসের সহিত সমর্থন করে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

১৯৩০ সালের পর থেকে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে দেখে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্টান্‌লী জ্যাকসন, বিপ্লবী আন্দোলনকে শান্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জে. এম. সেনগুপ্তের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেনগুপ্ত হঠাৎ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে চলে যাওয়াতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। লৌহ কঠিন আই. সি. এস. বর্গ সেনগুপ্তের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার গভর্নরকে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে বাধা দেয়। বক্সা-দুর্গ বন্দীনিবাসের কমাণ্ডান্ট কোটামের মামলা চলবার সময় জলপাইগুড়ি জেলে সেনগুপ্তের সাথে আমাদের দেখা হবার কথা আগেই বলেছি। আমাদের সাথে তাঁর মেলামেশা নিষিদ্ধ হলেও গোপনে একত্রিত হয়ে একসঙ্গে বসে তাস খেলা যেমন চলত তেমনি নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনাও চলত। সহজ রসালাপও হত। মিসেস সেনগুপ্তা একদিন জেলে দেখা করতে এসে জানালেন যে

বেনারস হতে জ্যোতিষ নাকি ভৃগু গণনা করে তাঁকে জানিয়েছেন যে, সেনগুপ্তের পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনের আশঙ্কা রয়েছে। এ কথা শুনে তিনি অবিশ্বাসের উচ্চ হাস্য সংবরণ করতে পারেন নি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুতে বলেছিলেন—স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে সব সাহসী যোদ্ধা সংগ্রাম করে গেছেন যতীন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম। মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য কোনও প্রকার ত্যাগ স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। অপরিসীম দুঃখের জীবনই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজয়ী যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা···যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গীকৃত তার স্মৃতি গৌরবের ও বেদনার।

অস্ত্রোপচারের ঘা সারতে একুশ দিন লাগল। ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট ফিনি সাহেব নিজে এসে আমার ক্যাম্পে ফিরতে আর ক'দিন লাগতে পারে জানতে চাইলেন। বুঝতে দেরি হল না চতুর ইংরেজ অফিসার কোনও অভিপ্রায় নিয়েই নিশ্চয়ই এসেছেন এবং অতি শীঘ্রই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। দেউলী ক্যাম্পে অচিরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে ফিনি সাহেব চলে গেলেন।

হাসপাতালে থাকার সময় রক্ষী-সিপাহীরা, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন রোগী মহলে বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবী বলে আমার পরিচয় জানিয়েছিল। তাই যাবার সময়ে সাধারণ রোগীরা বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবীকে দেখার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়াল। মহিলারা আমায় তাঁদের নিজের ভাষায় আশীর্বাদ করলেন—জানালেন অন্তরের শুভেচ্ছা।

তের

দেউলী বন্দীনিবাসে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকারের নির্দেশনামা পেলাম—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটকের নির্দেশ। ইতিমধ্যে কলকাতায় অলিপুরের বিশেষ আদালতে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে। মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, পরেশ গুহ, প্রভাত মিত্র, ভোলানাথ দাস, সত্যেন মজুমদার, অজিত বসু প্রমুখ অনেকেই আসামী হয়ে এসেছেন। বাজাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র ছিল মামলার মূল অভিযোগ। আব তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে ছিল,—উক্ত ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ, বিস্ফোবক দ্রব্যাদিব সংগ্রহ ও প্রস্তুতি, হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা প্রভৃতি। সরকাব পক্ষেব পাবলিক প্রসিকিউটাব শ্রীনগেন ব্যানার্জি উক্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবেব এবং দেউলী বন্দী নিবাসে আমার স্যুটকেশে পাওয়া চিরকুটের কথা তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাতে উল্লেখ কবলে ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত আমাকে আসামীভুক্ত কবে আদালতে উপস্থিতিব দাবী করে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে আমার নামোল্লেখ করলেও, জেলের বাইবে ষড়যন্ত্রেব সঙ্গে সংশ্রবের নির্ভবযোগ্য প্রমাণ না থাকায় পাবলিক প্রসিকিউটাব আমাকে আসামী শ্রেণীভুক্ত কবার কোনও প্রার্থনা জানাননি। ট্রাইব্যুনাল কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁরা সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন, আমাকে ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নায়ক বলে বিশ্বাস করাব যথেষ্ট কারণ রয়েছে—ক্যাম্প অথবা জেল হতে এই ষড়যন্ত্র পবিচালনা করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

দেউলী হতে আলিপুর জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচাবার্থে প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে আমায় হাজির করা হল। একদিকে সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটাব নগেন ব্যানার্জি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ বি. সি. নাগ ও গুনেন্দ্র সেন প্রমুখ। অন্যদিকে আসামীদের পক্ষে ব্যারিস্টার শ্রী জে. সি-

গুপ্ত ও তাঁর সহকারীরূপে শেখর বোস, এ্যাড্ভোকেট সুকুমার দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। আমাদের পক্ষে মামলা চালান অতি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ব্যারিস্টার জে. সি. গুপ্ত নামমাত্র দক্ষিণাতেই তাঁর সহকর্মীদের সাথে মামলা পরিচালনা করতে রাজী হলেন। শেষের দিকে এই নামমাত্র দক্ষিণাও তাঁদেব দেওয়া সম্ভবপব হয়ে ওঠেনি। কলকাতা হাইকোর্টের অথবা আলিপুর জজ কোর্টের কোনও উকিল বা ব্যারিস্টারকে এত কম দক্ষিণায় দীর্ঘকাল স্বদেশী মামলা পরিচালনায় পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ব্যারিস্টার এবং কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও হাইকোর্টের উকিল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়রা চেয়েছিলেন দৈনিক তিন'শ হতে দু'শ টাকা পর্যন্ত, যা আমাদের পক্ষে সে সময় সাধ্যাতীত ছিল। মেদিনীপুরেব খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও উকিল মন্মথ দাস মহাশয় বিপ্লবী দলকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের সন্দেহে মেদিনীপুর হতে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতায় ওকালতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আমরা তাঁব সাহায্যও অতি সামান্য দক্ষিণায় পেয়েছি। সে সাহায্যের মূল্যও কম ছিল না।

বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্তীব ফেরারী আড্ডায় প্রাপ্ত সঙ্কেতলিপিতে লেখা তালিকায় পাঞ্জাব, উত্তব প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বর্মার ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। বর্মা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ মাত্র ছিল। সঙ্কেতলিপি উদ্ধাবের ফলে এই সব প্রদেশ থেকে দলের বহু সভ্য ধৃত হয়। বর্মা থেকে ডাঃ বিনয় সেন, সঞ্জীব মুখার্জী, পাঞ্জাব থেকে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, যুক্তপ্রদেশ থেকে শ্যামবিহারী শুক্লা, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা (ওরফে পণ্ডিতজী) প্রমুখের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এঁরা ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের পার্টি সংগঠক। পার্টির দরদী ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করান হয়। সঙ্কেতলিপিতে লেখা নামের তালিকায় পুলিস বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের আড্ডার সন্ধান পায় এবং তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লাশী চালাবার ফলে

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি হস্তগত করে। রাজসাক্ষী হৃষিকেশ গুপ্ত (বরিশাল), জিতেন নাহা (ঢাকা) প্রভৃতির সাক্ষ্য শেষ হলে বহু দলিল পত্র পেশ করা হয়। তারপর চলে বিভিন্ন প্রকার সাক্ষীর বহর। সাক্ষীর সংখ্যাও ছিল দু'শর ওপর। কখনও পুলিস, কখনও ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, কখনও বিস্ফোরক-অভিজ্ঞ, কখনও বা আগ্নেয়াস্ত্র-অভিজ্ঞ, সঙ্কেতলিপি-অভিজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক পার্টিসভ্য, সাধারণ সাক্ষী, দেশ-বিদেশেব নানা ভাষাভাষী সাক্ষী, এমনি রকমারী সাক্ষীব এক বিপুল সমাবেশ হয়। আসামীদের কারও কারও ক্রন্দনরতা জননী ও ভগিনীদেবও সাক্ষীর কাঠগড়ায় খাড়া করা হয়। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত বোমা, পিস্তল, বোমার খোল, বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশে ট্রাইব্যুনালটি একটি ছোটখাট প্রদর্শনীর আকার ধারণ করে।

মামলা চলবার সময় আমরা সবাই কাঠগড়ার মধ্যে একত্রে মিলবার সুযোগ পেতাম। সে সুযোগ জেলে আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। সেখানে আমাদের দু'তিন ভাগে ভাগ করে রাখা হত। কর্তৃপক্ষ ভাগ করত তাদের খুশীমত, আমাদের পছন্দমত নয়। যে-সব বিশিষ্ট বন্ধুদের সাথে পরামর্শ দরকাব, কর্তৃপক্ষের এই ব্লক বিলি-ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হত। তাই কোর্টের কাঠগড়াই ছিল আলোচনা চালাবার ও পরামর্শ করার উপযুক্ত স্থান। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রমাণাদির বিবরণ শুনবার সাথে সাথে আমরা রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা কবতাম। বিপ্লবী সংগঠনকে যাতে আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে তোলা যায় তার জন্য বাইরে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন আলোচনা ছিল প্রধান বিষয়বস্তু। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করব—এই ছিল আমাদের একমাত্র ধ্যান। আলিপুর জেল থেকে পালাবার দুরূহ পরিকল্পনা তাই আমরা অতি সহজেই গ্রহণ করেছিলাম। দুরূহ বাধা বিঘ্ন আমাদের কাছে আর দুরূহ বলে মোটেই মনে হয়নি।

পালাবার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবার পর আমরা একটি পরিকল্পনা বেছে নিলাম।

বিশেষ আদালতের বিচার দিনের মতো শেষ হলেই আমাদের দু'খানা কযেদী গাড়িতে (কয়েদী গাড়িগুলো 'ব্ল্যাক মেরিয়া' নামে ইংরেজীতে পরিচিত) বোঝাই করে জেল ফটকে পৌঁছে দিত। সশস্ত্র পুলিসের গাড়ি আগে ও পেছনে চলত। আমরা বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে দেশবাসীকে জানাতুম মাতৃভূমির প্রতি আমাদেব আবেদন। সশস্ত্র গাড়ি দু'খানা আমাদের জেল ফটকের সামনে অবতরণ লক্ষ্য করত এবং আমরা জেল ফটকের অভ্যন্তরে পৌঁছলেই তারা জেল কর্তৃপক্ষ হতে আমাদের নিরাপদে ও হিসাবমতো পৌঁছাবার ছাড়পত্র নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেত তাদের ব্যারাকে।

সশস্ত্র রক্ষীদল আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলে বড় গেটের অভ্যন্তবে আমাদের ৩৪।৩৫ জনকে চার পাঁচজন সার্জেন্ট ও সিপাহী মিলে নাম লিখত ও তল্লাশী করত। তারপর জেলে ঢুকবার ভেতরকার গেট খুলে সিপাহীদের সাথে ভেতর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করত।

এই সুযোগে আমরা বড় গেটের সিপাহীদের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে জেলের বাইরে যাবার প্রচেষ্টা করলে হয়ত সফলকাম হতে পারি যদি গেটের বাইরের সশস্ত্র সিপাহীদের আমরা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। বাইরের সংগঠনের সাহায্য ভিন্ন তা সম্ভব নয় এবং তাদের লিখে জানতে চাইলাম যে তারা বাইরে থেকে পালাবার সময়ে আচ্ছাদক গুলি বর্ষণ দ্বারা সাহায্য করতে পারবে কিনা। বাইরের গেট্ প্রহরায় মোতায়েন রাইফেলধারী সিপাহীদের কোনও ভাবে পঙ্গু না করতে পারলে এই প্ল্যান কার্যকরী হওয়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন অপেক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে কোন উপযুক্ত সাড়া না পাওয়ায় আমরা এই প্ল্যান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

ইতিমধ্যে নতুন এক পরিকল্পনা মাথায় এসে গেল। আমরা যেন পথ খুঁজে পেলাম।

জেল বা ব্যারাকের গরাদ কেটে পালান নয়, তাতে মাত্র দু'এক জনের পালাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু এতে ছিল তখন অন্তত: ছয় সাত জনের যাবার সম্ভাবনা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একাংশ কালীঘাট গঙ্গার দিকের পার ঘেঁষে রয়েছে। এদিকে জেলেব অভ্যন্তরে রয়েছে সাজা দেবার ডিগ্রিগুলি (১৩।১৪ নং ডিগ্রি)। সেখানে আমাদের মামলার একদল বন্ধুকে রাখা হয়েছে আর একদলকে রাখা হয়েছে বম-ইয়ার্ডে। বম-ইয়ার্ড ছিল জেলের মধ্যভাগে।

বম-ইয়ার্ডেব দলকে যদি পালাবার দিন ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে একত্রিত করা যায় তবে আমরা ভেতরের ছোট নয় ফুট প্রাচীর পার হয়ে গঙ্গার ওপরকার বড় প্রাচীরও—সতর আঠার ফুট—পাব হতে ।ারি। তারপর জেলেব বাইরের গঙ্গা সাঁতার দিয়ে অনায়াসে পাব হতে পারব।

তাই প্রাথমিক সমস্যা হল, কি করে বম-ইয়ার্ড থেকে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে সবাই একত্রিত হওয়া যায়।

সুকৌশলে ট্রাইব্যুনালকে জানালাম যে মামলা পরিচালনার প্রয়োজনে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের পরামর্শের জন্য আমাদের সকলের জেলের ভেতরে একত্রিত হওয়া দরকার। ট্রাইব্যুনাল বিচার বিবেচনা করে জেল কর্তৃপক্ষের ও পুলিসের পরামর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটির দিন দিনের বেলায় উপযুক্ত নিরপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এক ঘণ্টার জন্য একত্রে মিলবার সুযোগ দিতে জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে পাঠালেন। জেল কর্তৃপক্ষ রাজী হল। আলিপুর জেলের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক পাটনী সাহেব আই. এম. এস. ও জেলার ছিলেন অপ্‌সন্‌ সাহেব। ছুটির দিন আমাদের গতায়াত শুরু হল।

কোর্ট ছুটির দিন অপরাহ্ণের দিকে সিপাহী এসে আমাদের বম-ইয়ার্ড থেকে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে নিয়ে যেত। এভাবে প্রাথমিক

আয়োজন শেষ হলে আমরা দেয়াল ডিঙোবার পরিকল্পনায় মন দিলাম। গঙ্গার পারে বাইরের দেয়াল দূর থেকে দৈত্যের মতো দেখায়। সতর আঠার ফুট উঁচু হলেও দেখায় যেন তার চেয়ে বেশী উঁচু, প্রতিটি ইট গুণে আমরা জানতে পেরেছি যে এর উচ্চতা আঠাব ফুটের বেশী হবে না এবং আমরা সারি বেঁধে একের পর এক কাঁধে উঠলে তৃতীয় ব্যক্তি অতি কষ্টে হলেও দেয়ালের শীর্ষস্থান নাগাল পাবে। কিন্তু বাইরের এই পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে গায়ে রয়েছে অভ্যন্তর প্রহরী। সরকারী প্রহরীদের সাহায্য করবার জন্য আবার রয়েছে একদল বাছাই করা কয়েদী-প্রহরী।

সরকারী সিপাহীদের সাহায্য করবার জন্য যেমন কয়েদী-সিপাহীর ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি বাইরের দেয়ালকে রক্ষা করবাব জন্য জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যারাক ও ডিগ্রিগুলি ঘিবে ছোট ৮।৯ ফুট উঁচু দেয়াল। সেখানে আবার দেয়ালের প্রতিটি ফটকের সাথে রয়েছে সরকারী প্রহরী ও নানাবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

অদূরে রয়েছে সু-উচ্চ গম্বুজ ঘর ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিগুলির সামনে —সমস্ত জেলকে দেখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। জেলের ভেতরে ও বাইরে প্রতিটি লোকের যাতায়াত সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

এতগুলি সতর্কতামূলক সরকারী ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে দেয়াল ডিঙোবার পরিকল্পনা সার্থক করতে হবে।

যে ৭।৮ জন বাইরে যাবে, তাদের সবাইকে ডিঙোবার কৌশল শিখে নিতে হবে। শেখার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরও বেশী লোকের প্রয়োজন। বম-ইয়ার্ডে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করবার ভার নিল জলপাইগুড়ির বিশ্বস্ত কর্মী অজিত কুমার বসু। ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রির ভার নিল ঢাকার অমূল্য সেন।

সেলগুলি মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ১৫ ফুট উঁচু হবে। একজনের কাঁধে আর একজন ওঠবার পর তৃতীয় জনের পক্ষে মাথা সোজা করে দাড়ান শক্ত হলেও শেখার কাজ তাতে চলতে পারে।

শেখবার সময় দেখা গেল প্রথম ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তার উপর তৃতীয় ব্যক্তি কাঁধের উপর চড়তে আনুমানিক ৩০ সেকেণ্ড সময় লাগবে। দৌড়ের উপর ওঠবার অভ্যাস করে দেখা গেল প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম দেয়াল ধরে দাঁড়াবে সে অতি সহজেই দৌড়ে ওঠবার বেগের ধাক্কাও সামলে নিতে পারে এবং তাতে হয়তো ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড সময়ও বেঁচে যেতে পারে। দিনের বেলায় আলিপুর জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে যেমনি দরকার হবে সতর্কতার ব্যবস্থা তেমনি দরকার হবে পালাবার কৌশল বিশেষ ভাবে আয়ত্ত কবা। সব চেয়ে বেশী দরকার—সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে মূহূর্তেব মূল্যকে কাজে লাগান। পালাবার সময় সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারলে শত্রু পক্ষের সব রকম হুঁশিয়ারী ব্যবস্থাকে নিস্ফল করে দিয়ে আমরা কলকাতা শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

পূর্বেই বলেছি যে জেলে হুঁশিয়ারী ব্যবস্থার অন্ত নেই। প্রত্যেক সিপাহীর কাছে রয়েছে বাঁশী, একজন সিপাহী বাঁশী বাজালেই অন্যান্য সিপাহীরা জেলের নানা দিক থেকে বাঁশী বাজাতে থাকে। গম্বুজ প্রহরী বাঁশীর শব্দে বৃহৎ ঘণ্টাটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে টানাবে—বিপদ্-জ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের দিগ্ নির্ণয়ক নম্বর প্লেট। বাঁশীর ও ঘণ্টার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র জেলের বাইরে থেকে ছুটে আসবে সিপাহীরদল যে যে অবস্থায় থাকবে ঠিক সেই অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি হাতে নিয়ে, এবং তার পেছনে আসবে উর্দি পড়া বাহিনী বড় বড় লাঠি বা অস্ত্র নিয়ে। ইতিমধ্যে একদল জেলের সিপাহী বাইরের বড় প্রাচীর ঘিরে রাখবে। বাঁশী ও ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিকটস্থ পুলিসের রিজার্ভ বাহিনী জেলখানার সাহায্যার্থে ছুটে আসবে তাদের দলবল নিয়ে। এই সতর্কতার নাম হল "পাগলাঘণ্টি।" লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করতে তিন থেকে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জেলের ছোট নয় ফুট উঁচু দেওয়াল থেকে শুরু করে ছোট-বড় দেয়ালের মধ্যস্থ ২৫ হাত খালি জায়গা পার হয়ে ১৭।১৮ ফুট উঁচু দেওয়াল টপকাতে হবে এবং তারপর উঁচু দেয়ালের বাইরে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত খালি জায়গা—প্রায় ৫০।৬০ হাত থেকে বর্ষার গঙ্গার ওপার পর্যন্ত সবগুলিই তিন মিনিটের মধ্যে সম্পুর্ণ করতে হবে, নইলে আমরা সমগ্র জেল ও পুলিস বাহিনীর সম্মুখীন হব এবং আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

সমস্ত রকম চুল চেরা হিসাব করে আমরা দেখেছি, সকলের পক্ষে তিন মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ওপারে পৌঁছান সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ঝড় বাদলের সুযোগ নিয়ে পালানর চেষ্টা করতেই আমরা মন স্থির করলাম।

সেলের ভেতর নিয়মিত অভ্যাস ও মহড়া চলছে। ঘড়ি ধরে সময়ের হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিচারাধীন আসামী অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম ছিল না, তাই সময়ের হিসাব শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরিখে নিয়েছি—এক কথায় একে বলা চলে নাড়ীর জ্ঞানে সময়ের হিসাব।

ঝড় বাদলের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, আবহাওয়া তথ্য থেকে। দৈনিক পত্রিকাতে আবহাওয়া তথ্য প্রকাশিত হয়। বিচারাধীন প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে আমরা একখানা ইংরাজী স্টেট্‌সম্যান কাগজ নিজ খরচে পেতাম। আমাদের সঙ্গে মামলার বিচারাধীন আসামী ছিলেন বন্ধুবর দ্বিজেন রায়। দ্বিজেন রায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক। বিস্ফোরক পদার্থ থেকে শুরু করে বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। আমাদের নিজস্ব দল ছাড়াও অন্যান্য দলও তাঁর সাহায্য নিত। বিপ্লবী দলের পুরানো বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিল। আবহাওয়া তথ্য পড়ে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার ভার ছিল তাঁর ওপর। তিনি নিয়মিত ভাবে আবহাওয়া তথ্যের আভাস দিয়ে যেতেন।

বক্সা দুর্গের কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেবকে মারবার অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলে মামলা চলবার সময় ১৯৩১ সালে অজিত বসুর সঙ্গে সঙ্কেতলিপি মারফত আমার পরিচয় ঘটে—অজিত বসু তখন জেলার পার্টি সংগঠক। সেখান থেকে পালাবার প্রচেষ্টাব কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩২ সালে রাজসাহী জেলে বন্দীদের ওপর অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য একখানা চিঠি সংগোপনে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সংগঠন মারফত পাঠিয়েছিলাম। চিঠি পেয়ে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অজিত বসু তখন কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বন্ধুবর প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্ত তখন পালিয়ে এসে সংগঠনের ভার নিয়েছেন। প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে কুমিল্লার সুধীব ভট্টাচার্যকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসেন এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় কর্মী ক্ষিতীশ দেব ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীদের—সত্য চক্রবর্তী, বাণী চক্রবর্তী, ভোলা সরকার প্রমুখের সাথে দেখা করেন এবং সুপারিণ্টডেণ্ট লিউক সাহেবের ওপব আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য প্রভাত দত্ত, ভোলা রায় ও সুধীর ভট্টাচার্যকে ভার দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় লিউক সাহেব নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি নিয়ে যাবার সময় ভোলা রায় সাইকেল দিয়ে গাড়িখানাকে থামিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং প্রভাত দত্ত পরপর গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে ভীষণভাবে জখম করে। পুলিস ভোলানাথ রায়কে আততায়ী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং লিউক সুটিং মামলায় তাকে সাত বৎসর সাজা দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু পুলিস প্রভাত দত্তকে সন্ধান করেও তখন বের করতে পারেনি। পরে সে ধৃত হলে প্রমাণাভাবে পুলিস তাকে অন্তরীণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সুধীর ভট্টাচার্য আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়ে এসেছিল কিন্তু লিউক সুটিং-এ যে তার সক্রিয় অংশ ছিল পুলিস তা শেষ পর্যন্তও জানতে পারেনি যদিও তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ তারা করে বেড়াচ্ছিল।

১৯৩৪ সালে অজিত বসু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী হবার পূর্বে অস্ত্রসহ ধরা পড়েন এবং প্রমাণাভাবে মুক্তি পেয়ে রাজবন্দী ছিলেন। জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য তাঁর ওপর ন্যস্ত বৈপ্লবিক দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে লাগলেন।

চৌদ্দ

এদিকে পালাবার প্রথম পর্যায়ের মহড়া নিয়মিত ভাবেই চলেছে। 'বম-ইযার্ডে' তিনজন—নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে ও লেখক মহড়ার শিক্ষা নিত। মাঝে মাঝে অপরাপর বন্ধুবাও ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রি থেকে এসে অতি সংগোপনে একত্রে শিক্ষা নিতেন। বম-ইয়ার্ডের ডিগ্রির বাইরের বাবান্দায় বসে একখানি সংবাদপত্র হাতে নিয়ে অজিত বসু অফিসাব সিপাহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন।

বম-ইযার্ডের শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুটির দিন অপরাহ্নে আমরা আবার ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে একত্র হতাম—আত্মপক্ষ সমর্থনে পরামর্শের অছিলায়। সেখানে আবার একদফা নতুন করে ডিগ্রির অভ্যন্তরে সত্যেন মজুমদার, ভোলানাথ দাস, সীতানাথ দে ও অমূল্য সেনের সঙ্গে মহড়ার শিক্ষা চলত। দিনের পর দিন আমরা এইভাবে শিক্ষাকার্য চালিয়ে যেতাম।

আমরা দিন গুণছি অনুকূল ঝড়ো হাওয়ার সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। কিন্তু হাওয়ার দেবতা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও এ পর্যন্ত পালাবার সময় সম্বন্ধে কোনও অনুকূল বিচার করেননি। একমাত্র ছুটির দিন অপরাহ্নে তাঁর অনুকূল দর্শন না পেলে আমরা যে তাঁর সহযাত্রী হতে পারব না, সেরূপ ধারণা তাঁর তখনও হয়নি। কখনও অপরাহ্ন বেলার এপারে, কখনও রাত্রির অন্ধকারে, আবার কখনও বিচারালয়ের কাঠগড়ার অভ্যন্তরে ঝড়ের আহ্বান এসেছে কিন্তু আমরা তখন

বন্দীশালার বদ্ধ কারাগারে পাহারাদারের সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যে অচল বা নিশ্চল হয়ে রয়েছি। এদিকে বর্ষার দিনগুলি তো প্রায় শেষ হতে চলল—আর তো সময় নেই! আমরা ভাবছি অনুকূল আবহাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি এক নির্দিষ্ট দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ব কিনা।

পালাবার প্ল্যান সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আনুকূল্যে অথবা দুপুরবেলাকার মাথাভাঙ্গা রোদের মাঝে—যেভাবেই আমরা চেষ্টা করি না কেন ঠিক হয়েছে যে ছোট দেয়াল ডিঙিয়ে যুগপৎ দু'টি সারিতে আমরা বড় দেয়াল পার হব। এক সারিতে থাকবেন—হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল ও লেখক; অন্য সারিতে থাকবেন—ভোলানাথ দাস, সত্যেন্দ্র মজুমদার ও সীতানাথ দে। সারি দু'টির সর্ব নিম্নে থাকবেন হরিপদ দে ও ভোলানাথ দাস। তাঁদের আমরা সংক্ষেপে base man অথবা ভিতের মানুষ বলতাম। ভিতের লোক হতে হলে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হওয়া দরকার, তাই তাঁরা ভিতের ভার নিয়েছিলেন। ভিতের লোকের ওপরে উঠবেন এক সারিতে নিরঞ্জন দে ও অপর সারিতে সত্যেন্দ্র মজুমদার, আবার তাঁদের উপর উঠবে এক সারিতে লেখক ও অন্য সারিতে সীতানাথ দে। অপেক্ষাকৃত লঘু দেহ বলে লেখকের ও সীতানাথ দে-র ভাগ্যে জুটেছিল শীর্ষস্থান—লঘু দেহের প্রতি তাচ্ছিল্য বশতঃই হোক অথবা সম্মান বশতঃই হোক বন্ধুরা তা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করেছিলেন।

সারি দুইটিকে বহিঃপ্রাচীরের প্রাচীর-রক্ষীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ঠিক হল, অমূল্য সেন প্রথমত তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে—প্রয়োজন হলে তাঁর জীবনের বিনিময়ে—রক্ষীদের প্রতিরোধ করবেন যতক্ষণ না প্রাচীরের ভেতর দিক হতে বন্ধুরা প্রাচীরের অপর পারে পৌঁছাতে পারেন। অমূল্য দৈহিক বলিষ্ঠতার জন্য যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি সাহসের জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। বয়সে নবীন হলেও সহিষ্ণুতারও অভাব তাঁর ছিল না। সাগ্রহ চিত্তে ও হাসিমুখে তিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত কাজের ভার বুঝে নিলেন।

বড় প্রাচীরের গা ঘেঁষে জেলের ভেতর দিক থেকে একটি পায়ে হাঁটার রাস্তা সমস্ত জেলকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে—সিপাহী ও অফিসারদের প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করবার জন্যই রাস্তাটি ব্যবহৃত হত। রাস্তার মাঝে মাঝে রয়েছে দেয়াল-প্রহরী। আবার এই রাস্তাকে স্থানে স্থানে উঁচু লৌহ গবাদেব বেড়া খণ্ডিত করেছে। বেড়ার গায়ে রয়েছে লোহার দরজা—কোথাও দরজা অর্গল বদ্ধ আবার কোথাও তা উন্মুক্ত। প্রাচীর-প্রহরীদের মধ্যে জেলের সাধারণ সিপাহী ছাড়াও কয়েদী হতে বাছাই করে এক দলকে প্রহরীর কাজে লাগাবার ব্যবস্থা ছিল। তাদের অনতিদূরেই ছিল সরকারী সিপাহীদের প্রহরার ব্যবস্থা। প্রাচীরকে রক্ষা করবার ভার ছিল উভয় শ্রেণীর কিন্তু সরকারী সিপাহীদের প্রাচীরের ওপর নজর রাখবার সাথে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীদের ওপরও নজর রাখার কাজ ছিল। জেলের ভেতরকার এই রাস্তার সাহায্যে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীরা যাতে নিজেদের গণ্ডির বাইরে জেলের অন্য স্থানে না যেতে পাবে তার জন্য সিপাহী-প্রহরী কয়েদী-প্রহবীব দিকের লোহার দরজাটি তাদের দিক হতে তালা দিয়ে বদ্ধ করে দিত। প্রাচীর রক্ষার কাজে এতদিন তাতে কোনও বিঘ্ন হয়নি।

১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রির ছোট দেয়ালের অপর পারে বড় দেয়াল থেকে টেনে দু'টি লোহার বেড়া দুই দিক থেকে এসে ছোট ও বড় দেয়ালের মাঝখানটায় যে একটি নিভৃত স্থান সৃষ্টি করেছিল ঠিক সেখানটায় কোনও প্রহরী ছিল না। লম্বা-চওড়া ৪০।৫০ হাত মাঝখানটির এই খালি জায়গাই ছিল আমাদের বড় দেয়ালে পৌঁছবার পথ। লোহার বেড়ার উভয় পারেই রয়েছে প্রহরী—একদিকে কয়েদী-প্রহরী, অন্যদিকে সিপাহী-প্রহরী। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েদী-প্রহরী তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিকে পাহারা দিত। বড় প্রাচীরের গা ঘেঁষে তালপাতার তৈরী ছাতার নীচে ছিল তার বসবার জায়গা—সঙ্গে থাকত কয়েদীর সম্বল অর্থাৎ কম্বল, গামছা, বাটি ও পানীয় জলের

ব্যবস্থা। মাথা-ফাঁটা রোদই হোক অথবা বিরামহীন বৃষ্টিই হোক, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটি ত্যাগ করবার জো ছিল না। দূর হতে প্রাচীরের সিপাহী-প্রহরীরা যেমন তার ওপর নজর রাখত তেমনি জমাদার, সার্জেন্টের দল যে কতবার তার 'ডিউটি' দেখতে আসত তার ইয়ত্তা ছিল না। বিনিময়ে সে পেত কারা আইনের নিয়মানুযায়ী তার কয়েদের দিনগুলির আংশিক হ্রাস—মুক্তির দিন এভাবে বৎসরের দুই তিন মাস পর্যন্ত তার এগিয়ে যেত।

প্রাচীরের বজ্রবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাচীরের কাছেই তাই তার আত্মসমর্পণ। নিঃসঙ্গ দেয়ালকে সঙ্গী করে কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বা বসে সে স্বপ্ন দেখত বাইরের যেখানে সে ফেলে এসেছে তার জীবনপ্রবাহ। তাকে ফিরে পাবার জন্য জেল জীবনের মধ্যে আবরণহীন অর্ধ উলঙ্গ রূপ নিয়ে মানুষের যে স্পর্শ ছিল তা থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত করে প্রাচীর-প্রহরীর নিঃসঙ্গতা বরণ করে নিয়েছিল যেন তার মুক্তির দিন সহজ হয়ে আসে। মেয়াদ হ্রাসের এই দিনগুলি তাই তার নিকট ছিল অতি মূল্যবান—জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে হত।

ডিগ্রির ভেতর থেকে পালাবার সময় প্রথমেই আমরা বাধা পাব সেখানে কর্তব্যরত সিপাহী, জমাদার, সার্জেন্ট, সুবাদারদের তরফ থেকে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে কড়া নজরে ও সংযত রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষ বাংলার সেণ্ট্রাল জেলগুলোতে প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রের ফেরতা ও সরকারী পেন্সনভোগী একদল সুবাদার শ্রেণীর সামরিক পাঞ্জাবী অফিসারকে আমদানি করেছিল। তাদের অনেকেই 'ফ্লাণ্ডার্স' যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহসিকতার জন্য সম্মান-পদক ভূষিত। জেলের সিপাহীদের কড়াভাবে পাহারা দেবার দায়িত্বে সজাগ করে রাখার ভার ছিল তাদের ওপর। সুবাদার শ্রেণীর মধ্য হতে একজনকে বাছাই করে সেদিন মোতায়েন করেছিল ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে। এদের বাধা এড়াবার জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম যে যদি একই সঙ্গে

আমরা সাত জন ছোট প্রাচীর অতি দ্রুত পার হয়ে যেতে পারি তবে এরা কেউই আমাদের রুখ্‌তে পারবে না। অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুদের অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আমাদের অনুসরণ করাও এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এদের দেয়াল টপকানোও শিক্ষা সাপেক্ষ। একমাত্র ছুটাছুটি, চীৎকার, পাগলাঘন্টি ও বাঁশী বাজিয়ে তারা সাহায্যের আবেদন জানাবে মাত্র।

পনের

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিবসটির যেন ইংগিত পেলাম। আগস্ট মাসের শেষ তারিখে (৩১ শে আগস্ট, ১৯৩৪ সাল) প্রাতঃকালীন ইংরেজী স্টেটসম্যান্‌ কাগজখানায় আবহাওয়া তথ্যের পূর্বাভাসের রিপোর্টে অপরাহ্নের দিকে প্রবল ঝড়-বাদলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ ছিল। সকাল বেলা থেকেই আকাশের গায় এলোমেলো ভাবে ছড়ান রাশি রাশি সাদা মেঘ দূর হতে দূর গগনে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের আহ্বানে দিক্‌চক্রবাল থেকে অনন্ত মেঘের পুঞ্জ মহাকাশের শূন্যতা ভরে দিতে লাগল। অসীমের নীল আকাশ ঢাকা পড়ল মেঘের আবরণে। সূর্যের স্তিমিত আভা নিঃশেষ হয়ে এল।

আমরা কয়জন বম-ইয়ার্ডে ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রিতে যাবার অনুমতি নিয়ে সিপাহীর আগমন প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। সিপাহী যখন এল তখন অপরাহ্নের দিকে বেলা গড়িয়ে গেছে। ১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রির গেট-প্রহরী আমাদের নিয়ম মাফিক তল্লাশী করবার পর ডিগ্রির আঙিনায় প্রবেশের অনুমতি দিল। ডিগ্রির বন্ধুরা আমাদের অপেক্ষায় আঙিনাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামান্য আকার ইংগিতে কথাবার্তা বলে আমরা ডিগ্রির ভেতর মহড়া দেবার জন্য ঢুকে পড়লাম। মহড়া শেষ হল। তারপর পরবার চারখানা ধুতিকে দড়ির মতো করে পাকিয়ে কয়েক হাত অন্তর কয়েকটি শক্ত গাঁট বেঁধে দিলাম। দু'খানা ধুতি দিয়ে একটি

করে দড়ি তৈরি হল। আমরা আর দেরি না করে ডিগ্রির ভেতর থেকে বাইরের আঙিনায় এলাম।

আসন্ন তুর্যোগের ছায়া পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মেঘের ঘন আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল দিকে দিকে—ছুটে এল পাগলা হাওয়া উন্মত্ত বেগে। গাছপালাগুলি তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন ছুটে বেড়াতে চায়। আকাশের গা চিড়ে মেঘের বুক থেকে বিত্যুৎ ঝলক্ মুহুর্মুহু রাঙিয়ে দিচ্ছে বিশ্বচরাচর—অনন্ত যাত্রাপথে আলোক বিচ্ছুরণ। ঠিক এমনি সময়ে "আমিও যাব" "আমিও যাব" বলতে বলতে ছুটে এল ডিগ্রির ছোট প্রাচীরের দিকে আমাদেরই অপর একজন বন্ধু জ্যোতিমুকুল ঘোষ। পালাবার পরিকল্পনা নির্দিষ্ট লোক ছাড়া কেউ জানত না। দশ-বার জন বন্ধুই শুধু জানত কিন্তু না জেনেও জ্যোতির বিপ্লবী মন বুঝতে পেরেছিল যে আমরা পালাবার আয়োজন করেছি এবং আজই তা সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে—তাই সাময়িক উন্মাদনায় তার মনের বাঁধন খুলে গেছে। যাবার জন্য তার নাম নির্দিষ্ট ছিল না। তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সুবাদারের জিম্মায় অসুস্থতার অজুহাতে জেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুবাদার তাকে পৌঁছে দিয়েই অবিলম্বে ফিরে এল।

সুবাদারের মনে সংশয় এসেছে—বাংলা দেশে বিপ্লবীদের অসম-সাহসের কত ঘটনা সে ঘটতে দেখেছে—কত বীর ফাঁসিতে গেছে, আর কতই না গেছে দীপান্তরে! জেলের ভেতর তাদের শক্ত বাঁধুনি দিয়ে ধরে রাখার কাজ হল তার। বিপ্লবীরা তুর্যোগের প্রলয়ঙ্করী আবহাওয়ার মধ্যে কি করবে কে জানে! জেলের আনাচে কানাচে বিপ্লবের রক্ত-শতদল। দীনেশের তাজা রক্ত এখনও শুকোয়নি। তাই সে ডিগ্রির আঙিনায় ত্রস্তপদে সিপাহীদের সতর্ক করে দিয়ে সাবধানী দৃষ্টি রেখে পাহারা দিচ্ছে।

ঝঞ্ঝার গতিবেগ বেড়েই চলেছে, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে। এবার মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। মেঘের গর্জন, বিত্যুতের ঝলকানি,

উন্মত্ত পাগলা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এসে যেন অকালে কালবৈশাখীর আহ্বান জানাল তারই সাথে সাথী হয়ে দিগন্তে ছুটে বেড়াবার জন্য। প্রহরীদের মনকে সাময়িকভাবে ভোলাবার জন্য আমরা ডিগ্রির ভেতর প্রবেশ করলাম। তারা আশ্বস্ত হয়ে ডিগ্রি ও উপডিগ্রির আঙিনার দরজাগুলো নামমাত্র বন্ধ করে দিয়ে বাইরের আঙিনায় পাহারা দিতে শুরু করল।

এবার পালাবার সিগন্যাল পড়ে গেল—এক-দুই-তিন। আমরা সবাই—হরিপদ, নিরঞ্জন, সত্যেন, ভোলানাথ, সীতানাথ, অমূল্য ও লেখক ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছি ছোট প্রাচীরের দিকে। প্রাচীর পার হতে যাচ্ছি এমনি সময়ে ডিগ্রির ভেতর থেকে এক কয়েদী পাহারাদারকে হঠাৎ সামনে দিয়ে বাহির আঙিনার ভেজান দরজার দিকে ছুটে যেতে দেখে বন্ধুদের সন্দেহ হল যে সে সুবাদার ও সিপাহীদের পালাবার খবর পৌঁছাতে যাচ্ছে। মুহূর্ত দেরি না করে বন্ধুরা তাকে ক্ষিপ্রগতিতে ধরে সেলের ভেতর টেনে নিয়ে গেল এবং মেঝেতে চিত করে ফেলে দিয়ে তার মুখে কাপড় গুঁজে হাত পা বাঁধতে শুরু করে দিল। ঠিক এমনি সময়ে আমিও তাদের সামনে এসে পড়ি এবং 'সময় নেই', 'সময় নেই' বলে হুঁশিয়ার করে দিতেই বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ কয়েদীকে ছেড়ে দিয়ে আদেশ দিল যেন সে সেলের দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে বসে থাকে। কয়েদীটি সেই ভাবেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই পর পর অতি সহজেই ছোট দেয়াল পার হয়ে গেলাম। পার হবার সময় দেখতে পেলাম কয়েদীটি আঙিনার দরজা খুলে যেন ছুটে বের হয়ে গেল। কানে ভেসে এল—প্রবল উৎকণ্ঠায় নিরুপায় হাবিলদার ও সিপাহীর দল সেলের আঙিনা থেকে সমস্বরে আর্তনাদ করছে—"আসামী ভাগতা হ্যায়", "আসামী ভাগতা হ্যায়"। আশপাশের অন্যান্য সিপাইরাও বাঁশী বাজাতে শুরু করেছে। পর্যবেক্ষণ-গম্বুজের দৃষ্টি পড়েছে।

একদিকে ঝড় বাদলের রুদ্র তাণ্ডবের সাথে ভয়ার্ত প্রহরীদের বাঁশীর শঙ্কা-ধ্বনি, অন্যদিকে শৃঙ্খল ভেঙ্গে জাতির মুক্তি সাধনে বিপ্লবের অভিযাত্রীদের সাথে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর সমগ্রশক্তি প্রয়োগের ব্যাপক প্রস্তুতির ব্যবস্থা। উন্মত্ত প্রকৃতি তার সমগ্র শক্তি দিয়ে যেন মুক্তির পথকে রক্ষা করছে। ঝড় বাদল ও বজ্রের শক্তি আমাদের দেহে সঞ্চারিত। চকিতে পৌঁছে গেলাম বড় দেয়ালের গায়। দূর হতে দেখা যাচ্ছে, বন্ধুবর অমূল্য সেন তার সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ মন নিয়ে লোহার দরজা আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওপারের সিপাইর সঙ্গে তার ঝুটোপটি ও লড়াই চলেছে। প্রথম সারিতে বন্ধুবর হরিপদ দে-র গা বেয়ে নিরঞ্জন ঘোষাল ঝটিতে উঠে যেতেই আমিও তৎক্ষণাৎ দড়ির এক কোণ দাঁতে চেপে হরিপদর গা বেয়ে নিরঞ্জনের কাঁধে চড়ে গেলাম। হরিপদ দে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামান্য একটু উঁচু হয়ে দাঁড়াতেই অতি সহজে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের শীর্ষে উঠে পড়লাম। ওপাশে দ্বিতীয় সারির দিকে দৃষ্টি দিয়ে ওপরের দিকে নজর দিতেই দেখতে পেলাম সু-উচ্চ গম্বুজ ঘরের সিপাহীদের অস্বাভাবিক চঞ্চলতা। গম্বুজ শীর্ষে মোতায়েন সিপাহীরা ঝোলান বৃহৎ ঘণ্টাটি জোর হতে জোরে দ্রুততালে ঢং ঢং শব্দে বাজিয়ে চলেছে—গম্ভীর হতে গম্ভীরতর উন্মাদনায়। ঝড়ের রুদ্র তাণ্ডবের কাছে তাদের প্রচেষ্টা মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসের গায়। বিপদজ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের দিক্ দেখাবার বোর্ডগুলি টাঙিয়ে দিয়েছে—জেলের অভ্যন্তরে সদর রাস্তার দিকে যেখান হতে ছুটে আসবে সাহায্য-বাহিনী।

দড়ির কোণটি হাতে নিয়ে প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে বাইরে পড়লাম—ঘাসে ভরা ভিজে মাঠের ওপর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে দড়ির কোণটি শক্ত করে ধরে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যেই নিরঞ্জনও দড়ি বেয়ে এপারে নেমে এল। নিরঞ্জনের হাতে দড়ির কোণটি দিয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ছুটে

এলেন গঙ্গার কিনারায়। গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি এমনি সময়ে সীতানাথ দেও ছুটে এসে হাজির হলেন। জলে ঝাঁপ দেবার সময় সীতানাথ দে বলে গেলেন সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাস দড়ি বেয়ে দেয়ালে উঠতে না পারায় সে দড়ি ছেড়ে দিয়ে একাই ছুটে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। বোধকরি অমূল্য সেনের ব্যূহ ভেদ করে সিপাহীর দল প্রাচীরের গায়ে এসে পড়েছে এবং বন্ধুদ্বয় সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাসের দেয়ালে উঠবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ষোল

সাগরের বাণী নিয়ে জোয়ার এসেছে, জোয়ারের বানের সাথে ঝড় বাদলের অবিশ্রান্ত জলরাশি মিশে কালীঘাটের মরা গাঙকে ভরা গাঙে পরিণত করেছে। উচ্ছল জলরাশি গঙ্গার বক্ষে ঢেউ তুলে ঝড়ের সাথে ছুটে চলেছে। প্রৌঢ় সীতানাথ দে তাঁর লঘু দেহ নিয়ে তরতর করে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। হরিপদ ও নিরঞ্জন একই সাথে ওপারে উঠে গেলেন। আমিও তীরের দিকে এগোচ্ছি কিন্তু স্রোতের টানে আমার দুর্বল দেহ কালীঘাট পুলের দিকে ভেসে চলেছে। তীরে পৌঁছতে আমার খানিকটা দেরি হতে পারে ভেবে বন্ধুদের জল থেকেই চলে যেতে নির্দেশ দিলাম, কিন্তু বন্ধুরা—হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল—আমার কথা না মেনে আবার জলে নেমে পড়লেন এবং তাঁরা তাঁদের হাত থেকে গামছার একটি কোণ আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আমি তার সাহায্যে তীরে উঠে পড়লাম। তীরে উঠেই জেলের দিকে এক পলক দৃষ্টি হেনে বুঝতে পারলাম যে সশস্ত্রবাহিনী প্রাচীর রক্ষার্থে তখনও এসে পৌঁছায়নি। পালাবার পর থেকে চার মিনিটের মতো সময় পার হয়ে গেছে—রক্ষীদের পৌঁছবার সময় আসন্ন প্রায়। ওপার হতে আমাদের দেখতে পেলেই 'শিকার' লক্ষ্য করে তাদের বন্দুকগুলি গর্জে উঠবে তাই মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বিদ্যুৎবেগে হিন্দু মিশনের

-গা বেয়ে ছোট্ট একটি রাস্তা ধরে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ছুটে আমরা বের হয়ে পড়লাম।

কলকাতার জনমুখর ও যানবহুল রাস্তা প্রবল বর্ষার ধারার তলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর বা যানবাহনের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। রাস্তার মোড়ের পুলিস পাহারাদাররা অন্তর্ধান হয়েছে। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রলয়ের দেবতা। ঝড ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এক হাঁটু জল ভেঙ্গে ঘুমন্তপুরীর মতো সারি সারি অট্টালিকাগুলির পাশ কাটিয়ে আমরা শহর থেকে বিভিন্ন দিকে বের হযে যাবার জন্য এগোতে শুরু করেছি। সীতানাথ দে একাকী চলে গেলেন হাওড়ার দিকে; হরিপদ দে দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে কস্‌বার দিকে। নিরঞ্জন ও আমি ছুটে চলেছি ভবানীপুরের দিকে। সেখানে থানার নিকটে পৌঁছেই অপেক্ষমান একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে চড়ে বসলাম। থানার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলাম যে থানার নীববতা ভঙ্গ হয়নি, পালাবার সংবাদ তাদের নিকট তখনও পৌঁছায়নি। ট্যাক্সিখানা আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে ছুটে চলল উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের দিকে। উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের নিকট পৌঁছেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে বিদায দিলাম। অতি সংগোপনে ও সযতনে অযেল পেপাব দিয়ে মুড়ে রাখা কয়েকখানি এক টাকার নোট সঙ্গেই ছিল। বর্ষার বা গঙ্গার জলে নোট কয়খানি নষ্ট হয়নি। নিকটেই এক পার্টি দবদী বন্ধুর বাসা ছিল, বর্তমানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। পুলিসের নজর আছে জেনে দূর থেকে বাণাঘাটগামী লোকাল ট্রেন স্টেশনে আসছে দেখে ছুটে গিয়ে আমরা তাতেই উঠে বসলাম।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে আশ্রয় নেব। কলকাতা শহর গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রস্থল। স্পেশাল-ব্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা বিভাগদ্বয় বিপ্লবীদের সকল রকম কেন্দ্র ও আড্ডাগুলিকে চষে বেড়াচ্ছে। যুগান্তর, অনুশীলন, বি. ভি. প্রভৃতি বিপ্লবীদলের চিহ্নিত ও সন্দেহভাজন কর্মীদের ওপর

শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে। পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই—আনুমানিক আধ ঘণ্টার মধ্যে—কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি, রেল স্টেশন ও দ্রুতগামী যানবাহন সবই পুলিসের ব্যাপক সন্ধান ও তল্লাশীর মধ্যে এসে যাবে। গোয়েন্দা পুলিস ও সাধারণ পুলিস তাদের যুক্ত সন্ধানী দল উপদল নিয়ে বিপ্লবীদের সকল আড্ডা, মেস্ ও বোর্ডিং ছেয়ে ফেলবে এবং তাদেব সাহায্য করবার জন্য রাইফেলধারী বাহিনী ছুটবে পুলিসের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়।

পুলিসের অসংখ্য গুপ্তচব বাহিনী এবং দেশদ্রোহীর দল সঠিক অথবা কাল্পনিক খবর দেবার জন্য অন্ধকার গুহা থেকে প্রভুদের নিকট এসে হাজির হবে। বাংলার বিল্পবী আন্দোলন দানা বাঁধবার সাথে সাথে দেশদ্রোহীর দল গজিয়ে উঠেছিল আগাছারই মতন জাতির বুকের পাঁজরের মধ্যে। জাতির শক্তিমান অংশকে নির্জীব ও শক্তিহীন করে দিয়ে তারা নিজেদের ও পরিবারের উদরপূর্তি করতে সংশয় করত না। সম্প্রতি এদের ধরাছোঁয়ার বাইরে যাবার জন্য আমরা শহরের বাইরে ছুটে চলেছি।

ট্রেনখানায় তেমন ভিড় ছিল না। ঝড়ের প্রচণ্ডতা থেমে গেছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও মুষলধারে পড়ছিল। আমাদের পরনে ধুতি ও ফতুয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সারা গাঁ বেয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়ছিল। এমন বেহদ্দ ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে কেউ যে গাড়িতে সওয়ার হ'তে পারে যাত্রীরা অনেকেই হয়তো ভাবতেও পারেনি। গাড়ির প্লাটফরম তো জলে ভরে গেল। অবাক হয়ে অনেকেই এমন করে ভিজে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। জড়িতকণ্ঠে অতি সংক্ষেপে জবাব দিলাম—শ্মশান থেকে ফিরছি। জবাব শুনেই সহানুভূতিতে অনেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দূরে বসল। নিরঞ্জনের মুখে মুচ্‌কি হাসি দেখে তার গাঁ টিপে দিয়ে মুখ নত করে বসে রইলাম যেন আমরা শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে আছি, কিন্তু আমাদের মনের ভেতর উভয়েরই অপ্রকাশ্যে রয়েছে গভীর আশঙ্কা। যাত্রীদের মধ্যে অলক্ষিতে উপস্থিত কোনও

গোয়েন্দা অফিসাব আমাদের সুপবিচিত মুখ দেখলেই চিনতে পারবে এবং শ্মশানের রহস্য বের হয়ে যাবে।

গাড়ি ছুটে চলেছে। পালাবার পব থেকে প্রায় এক ঘণ্টা হ'তে চলল—অদূরেই শ্যামনগব স্টেশন। শ্যামনগর পার হলেই ভাটপাড়ায় গাড়ি এসে যাবে। ভাটপাড়া স্টেশন মোটেই নিরাপদ নয। ভাটপাড়া স্থানটি বাজনৈতিকগন্ধী। গোযেন্দাদেব আনাগোনাব সম্ভাবনা তো এমনিই সেখানে আছে। সেখানে গাড়ি তল্লাশী হতে পাবে। ইতিমধ্যে নিশ্চযই কলকাতাব ও কলকাতাব নিকটস্থ স্টেশনগুলিতে তল্লাশী শুরু হযে গিযে থাকবে। আমরা তাই আব বেশী দূর না এগিযে শ্যামনগর স্টেশনেই নেমে পড়লাম। স্টেশন গেটে ছাড়পত্রের জন্য এক টাকার দুইখানা নোট দিযে বাইরে এসেই জগদ্দলেব দিকে পাযে হেঁটে রওনা হলাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক বোড ধবে দ্রুত এগিযে চলেছি—অদূরেই পুলিসের থানা। দূর থেকে থানার ভেতর অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য, যানবাহনের সমাবেশ ও বহু লোকের ব্যস্ততাপূর্ণ গতাযত দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো ম্লান হযে এসেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। গোধূলির ছায়া নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর। শ্রান্ত দেহকে সজোবে টেনে চলেছি কিন্তু কিছুটা পথ যেতেই হঠাৎ দূর থেকে বিপবীতমুখী একখানা পুলিসের সশস্ত্র গাড়ি বেগে ছুটে আসছে দেখে আমরা প্রমাদ গুণলাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম যেন দূর থেকে সশস্ত্র গাড়িখানা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তাবা নিকটে এসে বিপ্লবীর মতো অতটা ভযঙ্কর আমাদের দেখতে তাদের মনে না হওয়ায় সোজাসুজি শ্যামনগর থানার ভেতর গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল। এরা 'খুঁজে' বেড়াচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হেঁটে জগদ্দল শ্রমিক বস্তির ভেতব সত্বরই পৌঁছে গেলাম। এখানে পৌঁছে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে শুরু করেছি। জগদ্দল বাজারের ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গঙ্গাব পার ঘেঁষে, ভাটপাড়ার দিকে।

জগদ্দল বাজার—মজুরদের আনা-গোনার অন্ত নেই। উজ্জ্বল

বিজলী আলোয় বাজার ও রাস্তা আলোকিত। দিনান্তে মজুরদের পারস্পরিক আদর আপ্যায়ন তাদের গোষ্ঠী ছেড়েও পথচারীদের যেন সৌভ্রাত্রের আবেদন জানাচ্ছে। সোডা পানী, লাল ও নীল পানীয় জল, পান ও সিগারেটের ছড়াছড়ি। মলিন দেহ ও মলিন পোশাক পরিচ্ছদকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তরের রূপ তাঁর পরিচয় জানাচ্ছে। সস্তা মালের বিপণিগুলি ঘিরে রয়েছে মজুর ও মজুর গৃহিনীর দল—সস্তা মালের কেনাবেচার অন্তরালে সস্তা শ্রম-মূল্যের বিনিময়। অনতিদূরে বাজার পার হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের এক দিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলসের প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী গঙ্গার পাব ঘেঁষে, আব অন্য দিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলসের বাবুদের কোয়ার্টার নামে পরিচিত দ্বিতল গৃহশ্রেণী। এংলো-ইণ্ডিয়া জুট্ মিলস্ বাংলার পাটের ব্যবসাদার। পাট ও পাটজাত চট ও থলে তৈরি করে দুনিয়া জোড়া ব্যবসা গড়ে তুলেছে। মোটা মুনাফায় গড়ে তুলেছে বিদেশী ধণিকতন্ত্রের বিশাল ও দৃঢ় ভিত। আন্তর্জাতিক ধণিকতন্ত্রের মধ্যে পাটের ব্যবসাদাররা বিশিষ্ট, গণ্য ও মান্য বলে পরিচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তারা শক্তিশালী ধারক ও বাহক। তারই আশ্রয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র কুলি মজুর আর বাঙালী বাবুর দল—বংশ পরম্পরায় কেরানীকুল নামে খ্যাত—বিদেশী ধণিকতন্ত্রের মুনাফার যোগানদার আর ভুখা মিছিলের ভবিষ্যৎ সহযাত্রী।

বাজার ছেড়ে বাবুদের কোয়ার্টারের সামনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অন্ধকারের এক কোণে দাড়িয়ে বাবু-কোয়ার্টারে পরেশ ব্যানার্জীর খোঁজ করতেই পরেশ এসে হাজির হল। পার্টি দরদী, স্বভাবে দিল্‌দরিয়া ও বেপরওয়া প্রকৃতির লোক বলে পরেশ পরিচিত ছিল—নিরঞ্জনের বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বাসী বন্ধু। অন্ধকার কোণে এসে আমাদের দেখেই অবাক হয়ে জড়িয়ে ধরে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেল। পরেশের আনন্দ যেন আর ধরে না! জামা কাপড় বদলাবার

জন্য সে তার নিজের জামা কাপড় নিয়ে এল। ভিজে জামা কাপড় আমাদের গায়েতেই শুকিয়ে গেছে। স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে ঘরে ঢুকছি এমনি সময় পরেশের ছোট ভাই ভাটপাড়া থেকে এসে জানাল যে, ভাটপাড়ায় গাড়ি থামিয়ে অনেকক্ষণ তল্লাশী চলেছে। কলকাতার জেল ভেঙ্গে বিপ্লবীরা অনেকেই নাকি পালিয়েছে, তাদের ধরবার জন্য সর্বত্রই তারবার্তা এসেছে। কথা শুনে মনে হল, আমাদের গাড়িখানা বা পরবর্তী গাড়িখানা থেকেই তল্লাশী শুরু হয়েছে। আমাদের হিসাব নির্ভুল হয়েছিল। সময়মতই আমরা শ্যামনগর স্টেশনে নেমে পড়েছিলাম।

এবার মনে হল, পিছে রেখে আসা বন্ধুদের কথা। সত্যেন্দ্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, অমূল্য সেন দেয়ালের গায় ধরা পড়েছেন। তাঁদের জীবন রক্ষা হয়েছে কিনা সন্দেহ। সম্মুখ মৃত্যুর সাথে তাঁদের নিরস্ত্র লড়তে হবে। একমাত্র ভরসা তাঁদের মনোবল—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"—এই মনোবলই হয়তো তাঁদের সরাসরি খুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

সতের

হরিপদ ও সীতানাথ দে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তাঁদের আশ্রয়ে পৌঁছে থাকবেন। তবুও তাঁদের সঠিক সংবাদের জন্য কলকাতায় লোক চলে গেল। গভীর রাতে সে ফিরে এসে জানাল,—কলকাতার স্টেশনগুলি গোয়েন্দা পুলিসের আমদানীতে গিজ্ গিজ্ করছে, চারদিকেই পুলিসের সতর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টি যেন ওত পেতে রয়েছে যেমন করে বসে থাকে শিকার ধরবার জন্য বনের বাঘগুলো। পাছে তাকে অনুসরণ ক'রে পুলিস আমাদের আস্তানার সন্ধান পায় তাই সে কারও কাছে রাত্রে সাহস করে যায় নি।

রাত কেটে গেল প্রভাতী সংবাদের আশায়। সকাল বেলাকার কাগজ এল। দৈনিক বাংলা ও ইংরেজী কাগজগুলো তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে "আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের চাঞ্চল্যকর ও দুঃসাহসিক পলায়ন" শিরোনাম দিয়ে পলাতক রাজনৈতিক বন্দীদের নাম, ধাম ও রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছে। প্রাথমিক সংবাদে জেলের অভ্যন্তরে যাঁরা ধরা পড়েছেন তাঁদের নাম রয়েছে—সতোন মজুমদার, ভোলানাথ দাস ও অমূল্য সেন। পরবর্তী সংবাদে দেখতে পেলাম, পুলিস অভিযানের ফল স্বরূপ বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট হরিপদ দে গ্রেফতার হয়েছেন।

বন্ধুবর হরিপদ দে-র আকস্মিক গ্রেফতারের খবর অত্যন্ত মর্মান্তিক। সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের সাথে উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত করেই দুর্লঙ্ঘ্য গিরির মতো দুর্লঙ্ঘ্য জেল-প্রাচীর পার হতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। কলকাতা শহর ছেড়ে যাবার সময়ও তেমনি সময়ের সূক্ষ্ম বিচার আমরা করেছিলাম। তবুও মনে হল যেন হরিপদ সেখানেই মার খেয়েছেন। পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ নিকটতম বালিগঞ্জ স্টেশনের গায় গোয়েন্দা পুলিস নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং হরিপদ দে কসবা যাবার পথে পরিচিত গোয়েন্দা পুলিসের খপ্পরে পড়েছেন।

ব্রিটিশ শাসক ঘড়ির কাঁটার মতো তার আয়োজনী ব্যবস্থা সর্বত্রই সময়মত চালু করতে সক্ষম হয়েছে, সন্দেহ নেই। পলাতকদের ধরবার জন্য কলকাতা শহর ও বাইরে যে ব্যাপক অভিযান পুলিস সারারাত ধরে চালিয়েছে সংবাদে তার বিশদ বিবরণ ছিল। শহরের নানা স্থানে হানা ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারের সংবাদের সাথে কলকাতা হতে বহির্গামী ট্রেনগুলিকে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, নৈহাটি এমনকি বর্ধমান ও খড়্গপুর স্টেশন পর্যন্ত থামিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখার বিবরণও তাতে রয়েছে। পরে এই তল্লাশীর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে একদিকে মফঃস্বলের শহর ও পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায়,

ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় এবং অন্যদিকে সীতানাথ দে-কে ধরবার জন্য ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে পাঞ্জাব, ইউ-পি ও মাদ্রাজ অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদের ছোট বড সকল ব্যবস্থাগুলিই সংরক্ষণ নীতির উপর নির্ভরশীল। বিপ্লব আন্দোলনকে স্তব্ধ করবার জন্য চণ্ডনীতির অশেষ প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যেও যেন কোথায়ও দাগ টেনে যেত। আন্দোলনের ভবিষ্যতের ধারা জানবার জন্য বিপ্লবী দলের সভ্যদের মধ্যে যাঁরা তখনও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হননি, তাঁদের দু'চার জনকে ইংরেজ শাসক গ্রেফতার না করে বাইরে রেখে দিত যেন তাঁদের অনুসরণ করে পার্টির ফেরারীদের খোঁজ-খবর পেতে অথবা নবাগতদের রূপ ও পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি ক্ষমাহীন নীতির অন্তরালে, সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ছিল এই দ্বৈত নীতি বর্তমান হ'তে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত।

কুমিল্লার মণি দাশগুপ্ত ও নীহাররঞ্জন রায় তখন কলকাতার কলেজে পড়ত। পুলিসের কড়া নজর এড়িয়েও সংগঠনের সাথে যোগসূত্র রাখতে তারা সমর্থ হয়েছিল এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে তারা সক্ষম হল।

বিপ্লব-আন্দোলনকে বাঁচাবার প্রয়োজনে ফেরারী হিসাবে আত্ম গোপন করে যাঁরা জেলায় জেলায় ঘুরে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবব্রত রায়, মাখন কর, পৃথ্বীশচন্দ্র পুরকায়স্থ এবং বিশিষ্ট নারী কর্মী পারুল মুখার্জি অন্যতম। আমাদের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরারী প্রফুল্ল সেন জগদ্দলে পরেশের বাসায় এসে হাজির হলেন। প্রফুল্ল সেন পার্টির পুরানো কর্মী। ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বৈপ্লবিক পার্টির সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রেখেও কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন ও কাজের সঙ্গে তিনি সাধ্যমত নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে সীতানাথ দে চন্দননগর থেকে নদী পার হয়ে এপারে এসে হাজির হলেন। জগদ্দলে পরেশের বাসা

আনাগোনায় ভারী হয়ে উঠল। সামান্য মাত্র সন্দেহের অবকাশ পেলেই পরেশ পরিবারসহ 'জবাই' হবে ভেবে আমরা পরেশের বাসা ছেড়ে অন্যত্র যাবার সিদ্ধান্ত করলাম।

জগদ্দলে শ্রমিক বস্তিগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে—বাঁশের মাচার ওপর টালি দিয়ে তৈরী ছাদ আর মাটির দেওয়াল—জানালা বা বায়ু নিষ্কাষণের কোনও ব্যবস্থা তাতে নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন গোয়েন্দা পুলিসের নজর এড়াবার জন্যই তৈরি হয়েছে। শ্রমিক বস্তির ভেতর তাদের অংশীদার হয়ে একখানা কোঠা ভাড়া করে আস্তানা গেড়ে বসলাম। তারা কেউ সন্দেহ করল না, এরা কারা ? শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সন্দেহের অবকাশই বা কোথায় ! তারা জানে, পেটের তাড়নায় দুনিয়ার লোকগুলো ঘুরে মরছে এবং আমরাও তাদের মতই কলের চাকুরে অথবা চাকুরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি। আশে-পাশে চারদিকেই ছড়িয়ে আছে কল আর কল, বাবু ও মজুরের দল ! কলের বাঁশী বাজবার সাথে সাথে আমাদেরও তাদেরই মতন ছুটতে হবে নিশ্চয় !

এখান হতে প্রাথমিক কাজ আমরা শুরু করে দিলাম। পার্টির বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথে দেখা করবার জন্য কতকগুলি সাক্ষাৎ-কেন্দ্র সবে মাত্র খুলেছি। সাক্ষাৎ-কেন্দ্রগুলি নামহীন নম্বর যুক্ত, কোথাও তা কোনও গাছের নীচে, কোথাও বা রেলের ধারে, কোথাও বা নদীর পারে, আবার কোথাও বা তা পুরানো পুকুর ধারে—V^1, V^2, V^3, V^4, V^5 প্রভৃতি নম্বর দেওয়া। একমাত্র সাক্ষাৎকারীরা ছাড়া আর কেউ এদের সঠিক স্থানীয় অস্তিত্ব জানত না। ভাটপাড়া স্টেশন থেকে অনতিদূরে সন্দেহমুক্ত পাড়ার ভেতরে একখানি বাসা ভাড়া করে রেখে দিলাম, যেন বন্ধুরা কেউ আশ্রয় অভাবে ধরা না পড়ে।

ইতিমধ্যে দমদম গ্লাস ফ্যাক্টরীর অন্যতম সত্বাধিকারী পার্টির পুরানো বন্ধু শ্রীঅনাদি সেনগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দমদম গ্লাস ফ্যাক্টরীতে নিরঞ্জন ঘোষালকে নিয়ে অতি সাবধানে দিনের বেলায় দেখা করতে সমর্থ

হলাম। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেন মহাশয় ছিলেন ভাবপ্রবণ, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, উদারচেতা লোক। তাঁর চরিত্রে ছিল আন্তরিকতার সঙ্গে সাহসিকতার সহজ সংমিশ্রণ,—বৈপ্লবিক কাজে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। য়ুরোপ প্রবাসে অভিজ্ঞতার ফলে পাশ্চাত্য আন্দোলনের ধারার বিচারে তিনি ১৯২০ সালের পর জাতীয় আন্দোলনের কর্মধারার মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সূত্র বেঁধে দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, কালী সেন, প্যারী দাস ও নীরোদ চক্রবর্তী প্রমুখ বন্ধুদের সাথে একযোগে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কক্ষে বসে অনেক বিষয় গোপন আলোচনা হবার পর তিনি আমাদের হাতে একটি রিভালভার গুলি ভর্তি করে উপহার দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, গ্লাস ফ্যাক্টরীর অনেক শ্রমিক, তাঁর কনিষ্ঠ ভাই এবং ফ্যাক্টরী-ম্যানেজার আমাদের গতায়াত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের চরিত্রগুণে ঐ সময়ে কোনও সংবাদই পুলিস পেতে সমর্থ হয় নাই—এটা তখনকার দিনে কম গৌরবের কথা ছিল না। বাংলার প্রত্যেক জীবন-কেন্দ্রে বিপ্লবীদের কার্যকারিতা বাড়বার সাথে পুলিসের গোপন চরদেরও উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ঢাকার বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী ধনেশ ভট্টাচার্য দেউলী বন্দী নিবাস হতে কুষ্ঠ রোগ সন্দেহে চিকিৎসার জন্য পুলিসের নজরবন্দী হয়ে সিউড়ি কুষ্ঠ-হাসপাতালে মাত্র কিছুদিন পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিবারে তার জন্ম। তার বড় ভাই দীনেশ ও ছোট ভাই দুর্গেশ বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট সভ্য ছিল। ধনেশ ছিল ব্যায়ামবীর পরেশনাথের শিষ্য। ১৯২০-২১ সাল থেকেই বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লবের কাজে সে আত্মনিয়োগ করেছিল। কুষ্ঠের করাল আক্রমণেও সে নিজেকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে নিতে চায়নি। আমাদের পালাবার খবর পেয়েই ধনেশ কুষ্ঠাশ্রম থেকে পালিয়ে এসে ভাটপাড়া

ফেরারী কেন্দ্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হল। চিকিৎসা জলাঞ্জলি দিয়ে কেন সে চলে এল, আমরা অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ধনেশ হাসি মুখে উত্তর দিল,—'আসন্ন বিপ্লব প্রচেষ্টায় যোগ দেবার জন্য এসেছি—কুষ্ঠ রোগে ধুকে ধুকে মরবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত নই। ধনেশের প্রিয় শিষ্য শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী এর পূর্বেই অন্তরীণ থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত খবর পেয়ে ভাটপাড়ায় চলে এসেছে। বহুদিন থেকেই ফেরারী জীবন সে যাপন করে এসেছে এবং পার্টির বহু গোপনীয় ও জরুরী কাজের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। স্বভাবে অমায়িক, ব্যবহারে মার্জিত, নিঃস্বার্থ, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ, তরুণ শিক্ষিত যুবক—অভিজ্ঞতা তার বৈপ্লবিক কাজের ভেতর শৃঙ্খলা এনেছে। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সাথে তার ঘনিষ্ঠ ফেরারী বন্ধু দেবব্রত রায়ও সিলেট থেকে ভাটপাড়ায় এসে হাজির হল।

ধনেশ ভট্টাচার্য সাংগঠনিক দুর্বলতা, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের স্বল্পতা অনুভব করে সিদ্ধান্ত করল যে, সে তার রাজনৈতিক কর্মস্থান ঢাকায় চলে গিয়ে অর্থ ও অস্ত্রের আংশিক ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে। ব্যবস্থামত সে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢাকায় চলে গেল এবং স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হল।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিস ইতিমধ্যেই খবর পেল যে ধনেশ ঢাকায় এসেছে এবং সংগঠনের আশ্রয়ে রয়েছে। অতি তৎপরতার সঙ্গে পুলিস তার জাল বিস্তার করতে শুরু করল এবং পার্টি সভ্য ও গোয়েন্দা পুলিসের চর হীরালাল চক্রবর্তীর সাহায্যে ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদীর ওপারে সুবুড্যা গ্রামে ধনেশকে অতর্কিতভাবে রিভালভার সহ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল।

ঢাকার কর্মীরা ক্ষেপে গেল। বিশ্বাসঘাতককে চরম দণ্ড দেবার

জন্য তারা প্রস্তুত হল। হীরালাল জানত না যে তার বিশ্বাসঘাতকতা পার্টির সভ্যরা বুঝতে পেরেছে। অনায়াসে তারা তাকে ডেকে নিয়ে গেল এবং ঢাকা শহরের টীকাটুলী রেল-লাইনের পাশে ছুরির আঘাতে বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দিল। পুলিস এসে পেল মরণোন্মুখ হীরালালকে এবং মরবার আগে সে অমূল্য রায় ও পরেশ সেনের নাম বলে গেল। বিশেষ আদালতের বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু হাইকোর্টে আপিলে তাদের বয়স কম বলে ফাঁসির আদেশ যাবজ্জীবন দণ্ডে পরিণত হল।

রিভালভার রাখার অভিযোগে ধনেশের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল। আমরা হারালাম পার্টির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন বন্ধু ও সাহসী যোদ্ধা। ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের জবাব দেবার মুখেই বিপর্যয় ঘটে গেল। দুইজন তরুণ বিপ্লবী যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে দেশ থেকে নির্বাসিত হল।

১৯৪৬ সালে মুক্তির পর অমূল্য রায় ঢাকাতেই বাস করছিল। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক মুসলমান গুণ্ডার দল তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে সে একখানি বস্ত্রমাত্র সম্বল ক'রে অতি কষ্টে কলকাতায় চলে আসতে সক্ষম হয়। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কঠিন টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় কলকাতার লেক হাসপাতালে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন করবার কল্পনা নিয়ে ঘর ছেড়ে যে বাইরে এসেছিল, দেশকে স্বাধীন দেখেও অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে চরম দুঃখের ভেতর দিয়ে সে চলে গেল অমরলোকে।

আঠার

একদিন বিকালের দিকে বেলা গড়িয়ে যাবার একটু আগেই ভাটপাড়া রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী একটি সরু পথ ধরে চলবার সময় সামান্য দূর হ'তে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার পথের উপর দাঁড়িয়ে পার্টির বিশিষ্ট সভ্য চারুবিকাশ দত্তের সাথে আলাপ করছে। অফিসারটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। তাকে ঘিরে রয়েছে তার দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের কাজে অফিসারটির কুখ্যাতি বিপ্লবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিষ্ঠুর দমন ও দলন ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং তার জন্য সরকারী মহলে সে বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। তার জীবন রক্ষার প্রয়োজনে দুইজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা। আর কয়েক পা এগোলেই তার সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টির মিলন হবে অনিবার্য। সাক্ষাৎ ঘটলে আমরা কি করব ভাবছি—নিরঞ্জন অস্ত্র সমেত তৈরী। এমন সময় মনে হল যেন চারুবিকাশ আমাদের চিনতে পেরে সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা ঢেলে দিলেন অফিসারটিকে সামনের দিকে ঠেলে নেবার জন্য। অজস্র কথার জাল বুনে অফিসার ও তার দেহরক্ষাদের একটিবারও পিছন দিকে তাকাবার ফুরসৎ না দিয়ে অন্য এক পথে তিনি তাদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতায় চারুবিকাশ দত্তের দোসর মিলা এক সময় কঠিন ছিল, তারই পরিচয় তিনি আবার নতুন করে দিলেন। ভুজঙ্গের দংশন অথবা মরণ-আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতি, কে বলতে পারে? কিছুক্ষণ পর চারুবিকাশ দত্ত আবার সেই পথে ফিরে এসে আমাদের সংবর্ধনা জানালেন। ভাটপাড়া শহরে তাঁকে সবেমাত্র অন্তরীণ করা হয়েছে এবং অন্তরীণের জায়গা ঘিরে পুলিসের আনাগোনাও শুরু হয়েছে। আমরা সে খবর জানতাম না বলেই

তোপের মুখে হঠাৎ গিয়ে প'ড়েছি। অবস্থা বুঝে অবিলম্বে ভাটপাড়া কেন্দ্র ছেড়ে দিলাম।

অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টার সাথে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতির আয়োজন আমরা শুরু করেছি। "টি. এন. টি" বোমা, বিষ-গ্যাসের বোমা এবং ধোঁয়া-বোমা বানাবার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের দরকার। বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন রায় তো জেলে! পালাবার সময় তাঁর মৌখিক নির্দেশ ও ফরমুলা জেনে নিলেও তাকে কার্যকরী করতে অথবা তার ত্রুটি সংশোধন করতে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রয়োজন। ঐ সময় আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য রাখবার, প্রস্তুত অথবা সংগ্রহ করবার জন্য যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে ফাঁসি পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে যাঁদের ওপর ভরসা করা হয়েছিল, তাঁরা কেউ এগোতে রাজী হলেন না। আমরা আবার নতুন করে বৈজ্ঞানিকের খোঁজে বের হ'লাম। এ ব্যাপারেও অনাদি সেন মহাশয় পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে তিনি একাজের উপযুক্ত একজন বৈজ্ঞানিককে শীঘ্রই নিয়ে আসবেন। সেন মহাশয় ছিলেন ভাবের উন্মাদ—বাঞ্ছিত মনুষটিকে সত্বর নিয়ে এলেন। অনুশীলন কুল গৌরব রবীন্দ্রমোহন সেনের ভাগ্নে মিলু নামে পরিচিত বৈজ্ঞানিক।

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনা সমাপ্ত হয়েছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। তার বিজ্ঞান সাধনার নির্লিপ্ত স্তরে অনুপ্রবেশ করেছে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক কোলাহলের সুর,—বিদেশী দাম্ভিক রাষ্ট্রের ও শাসকবর্গের গ্লানিকর অবিচ্ছিন্ন লুণ্ঠন, অবহেলা ও অবমাননার রাশি রাশি ঘটনার কল্লোল। বিজ্ঞান সাধনার ওপর ছড়িয়ে ছিল, তাঁর মনের ক্ষুব্ধ হুঙ্কার। কলকাতার উপকণ্ঠে উল্টাডাঙ্গায় রাত্রির তমিস্রার ভেতর উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সেন মহাশয়ের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সক্রিয় সাহায্য করতে তিনি রাজী হলেন এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য

বিজ্ঞান ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্রের আবশ্যকতার কথা তিনি জানালেন।

রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার ও প্রাথমিক আয়োজনের জন্য টিটাগড় রেল-স্টেশনের অনতিদূরে ভদ্রপল্লীর মাঝে ছোট্ট একখানা বাড়ি ভাড়া করা হল। বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতিবেগ বাড়বার সাথে সাথে দরদী পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ের গণ্ডির বাইরে অনেক কাজই সম্পন্ন করতে হ'ত ; কারণ বিপজ্জনক রাজদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়-দাতাদের পরিচয় পেলে যেসব কঠিন সাজার আধুনিকতম ব্যবস্থা ছিল তাতে সম্পূর্ণ পরিবারই 'জবাই' হবার সম্ভাবনা ছিল। তৎসত্ত্বেও বাংলার পল্লীতে বা শহরে যাঁরা আশ্রয় দিতেন, তাঁদের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁরা নিজেদের বিপদের কথা জেনেও পার্টির সভ্যদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন, সংগোপনে অস্ত্রশস্ত্র রেখেছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন এবং বিপ্লবী দলের জরুরী খবর পুলিসের নজর এড়িয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বা শহরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। পল্লীর মাঝে এই ঘরটিকে পুলিসের চোখে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য গৃহস্থ পরিবারের মুখোশ পড়ান দরকার বিবেচনা করে পার্টি সভ্য শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে খুলনা থেকে টিটাগড়ের বাসায় আনবার ব্যবস্থা হল।

অনুশীলন দলের কুমিল্লা জেলার সংগঠক অমূল্য মুখার্জি ছিলেন পারুলের বড় ভাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে অমূল্য মুখার্জি অর্ডিনান্সে গ্রেফতার হয়ে বিনা বিচারে বক্সা প্রভৃতি ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় থাকেন। পারুল মুখার্জিও তখন হ'তে কুমিল্লা শহরে পুলিসের নজরবন্দী ছিল। ১৯৩৩ সালে নজরবন্দী অবস্থা এড়িয়ে পারুল ফেরারী জীবন যাপন করতে শুরু করে এবং উত্তর বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সংগঠনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে পারুল টিটাগড়ের বাসায় এসে হাজির

হল। পারুলের উপস্থিতির ফলে টিটাগড় বাসাকে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মতই দেখাল।

জনৈক প্রফেসার বন্ধুর সাহায্যে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মারফত বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ও উপকরণাদি যোগাড় করে এনে টিটাগড় বাসায় রাখা হল। বিস্ফোরক বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও এনে জড়ো করা হল। আরও আনা হল—বোমার খোল বা মিলস্ বোমার ছাঁচ্। বোমার খোল বা দেহটি ৩২ খণ্ডে খাঁজ কাটা ছিল যাতে বিস্ফোরণের সাথে সাথে ৩২টি খণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের কাজকে ত্রুটিহীন ভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে "টি. এন. টি." বোমাই ছিল ধ্বংসের কাজে অগ্রণী। এর পূর্বে বাংলার বিপ্লবীরা "অ্যামন পাইক্রেট" জাতীয় বোমাই ব্যবহার করে এসেছে। ১৯১৩ সালে রাজাবাজারের প্রাপ্ত বোমা (অমৃত বা শশাঙ্ক হাজরাই ছিলেন প্রধান নায়ক), ১৯১৩ সালে শ্রীহট্ট, মৌলবি বাজারে গর্ডনের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা (ঘটনাস্থলে যোগেন্দ্র চক্রবর্তী মারা যান এবং অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বলকে গুরুতর আহত অবস্থায় লালমোহন দে মহাশয় ঢাকায় নিয়ে আসেন), ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, (বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন)—এ সবই ছিল "অ্যামন পাইক্রেট" তৈরী বোমা। একমাত্র কলকাতা ডালহৌসি স্কোয়ারে ১৯৩০ সালে পুলিস কমিশনার টেগার্টের উপর নিক্ষিপ্ত বোমাই ছিল "টি. এন. টি." জাতীয়। কিন্তু বোমার খোল ছিল এলুমিনিয়াম ধাতুতে তৈরি। শোনা যায়, ধাতুর এই অসম্পূর্ণতার জন্যই বোমা বিদীর্ণ হবার সময় একদিক দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তার ফলে পুলিস কমিশনার টেগার্টের প্রাণ রক্ষা হয় ও নিক্ষেপকারী বিপ্লবী অনুজা সেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং বোমার টুকরাতে আহত হয়ে দীনেশ মজুমদার ধৃত হন। বোমার রাসায়নিক মসলা তৈরি হবার সময়

মেকানিজম-এর জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও তৈরি হয়ে যাবার পর বিস্ফোরক দ্রব্যের শক্তি অনুযায়ী বোমার খোল ও তার ধাতব গঠন এবং বোমাকে বিদীর্ণ করবার ফিউজ প্রভৃতির জন্য দরকার হয়ে থাকে একজন উপযুক্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের। এখানে হবিপদ দে'র অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।

বৈজ্ঞানিকের সাহায্যের জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের উচ্চশ্রেণীর একজন ছাত্র দরকার হবে জেনে প্রফুল্ল সেন বরিশাল জেলা সংগঠনের সংগঠক বিজ্ঞান ক্লাসের মেধাবী ছাত্র, সন্তোষ সেনকে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে কোনও একটি মিলন কেন্দ্রে ('V' কেন্দ্রে) আনবার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী অচিরেই সন্তোষ এসে হাজির হল। সন্তোষের সঙ্গে পরিচয়ে মনে হল, সন্তোষ হালকা মনের তৈরী মানুষ। তার মনের কাঠামোতে গুরু গম্ভীর ছন্দের অভাব। সমিতির প্রারম্ভিক কালে লাঠিখেলা, অসি ও ছোরা চালনা, দৈহিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রমের যে সুনিপুণ ব্যবস্থা ছিল যার ফলে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সামরিক নিয়মে অভ্যস্ত একদল সবল আদর্শগত মানুষ তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার অবসান ঘটেছিল নানা কারণে। জানবার ও বুঝবার প্রাথমিক উপাদান চলে যাবার পর শক্ত "মানুষ" বাছাই-এর কাজ মনের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ভেতর দিয়েই সম্ভবপর ছিল। দুর্বল ও সবল মানুষের ভেদাভেদ জানবার আর কোন সঠিক নির্দেশ ছিল না।

ডুবুরী সংগঠক ভিন্ন মানুষ বাছাই শক্ত হয়ে দাঁড়াল। একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনার অবলম্বনেই মানুষটির আসল পরিচয় মিলতে পারে। আমাদের তখন প্রয়োজনের তাগিদ রয়েছে, তাই ভাণ্ডারের তলানী থেকে সন্তোষকে বিজ্ঞানীর সাহায্যকারী হিসাবে নেওয়া হল। তবুও ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা ভেবে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যাতে তার চাক্ষুষ মিলন না ঘটে অথবা সে যাতে তাঁকে চিনতে না পারে তার জন্য ঠিক হল যে আপাদমস্তক বহির্বাসে ঢেকে বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজস্ব ঘরে কাজ

করবেন এবং অতি বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে "কাউন্টারের" একপাশ হতে সন্তোষ সেনের সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্য বিনিময় অথবা নির্দেশ বিনিময় করবেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা শহরে কালীঘাটের নিকটে ঘর ভাড়া নেবার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ হল।

বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বা বাংলার বাইরে যাঁরা বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করবার জন্য খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তর ভারতে বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠন ফাঁসি বা দ্বীপান্তরে বহুসংখ্যক সদস্য হারিয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং পরবর্তী কালে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, জগবন্ধু ভট্টাচার্য ও সুশীল ভট্টাচার্য প্রমুখ তারই সূত্র ধরে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের ফলে জিয়ান সংগঠন আবার 'মার' খেয়ে গেল। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের ওপর লাহোর দুর্গে অকথ্য অত্যাচারের ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল এবং ষড়যন্ত্রের মূল আসামী হিসাবে তাকে এবং সীতানাথ দে-কে দাঁড় করান হল। তবুও শক্ত মানুষগুলি বারবার মার খেয়েও হাল ছেড়ে দেয়নি। সেখান থেকে কেশবপ্রসাদ শর্মা এলেন সীতানাথ দে-কে নিয়ে যাবার জন্যে, আবার যাতে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সফল করে তোলা যায়। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের সংগঠনের ভার নিয়ে তার যাবার সিদ্ধান্ত হল।

যুগান্তর দলের নাম ও পরিচয় দিয়ে শান্তি সেন ফরিদপুর থেকে এসে দেখা করল। তারা 'কাজ' চায়, কাজের তল্লাশে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করতে তারা ইচ্ছুক। দলের কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরাও তখন একত্রে চলতে প্রস্তুত। শান্তি সেনের সঙ্গে ঠিক হল, নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে (ইংরেজীতে "action" বলা হ'ত) সম্পূর্ণ করতে যে নিয়মানুবর্তিতা ও

সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার হবে, তার শিক্ষা দেবার এবং অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেবার ভারও সে নেবে।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল ও দেবব্রত রায় জামসেদপুর, রাঁচী প্রভৃতি জায়গায় অস্ত্রের সন্ধানে ও সংগঠনের কাজে বের হয়ে গেল। রাঁচীতে তখন পার্টির পুরানো বিশিষ্ট সভ্য দক্ষিণ কলকাতার সুশীল ব্যানার্জি অন্তরীণ ছিল। সুশীলের সঙ্গে অতি সংগোপনে নিরঞ্জন দেখা করতে সক্ষম হলে সুশীল তাকে বৈপ্লবিক সৌহার্দ্য জানাল এবং অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করল। যুগান্তর দলের নায়ক শ্রদ্ধেয় যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান উপদেশও সুশীল নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিল।

কলকাতার নিকটে বেলঘরিয়া কেন্দ্রে অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা ও শিক্ষা-কার্যের জন্য সবেমাত্র একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সিলেটের ফেরারী বিপ্লবী প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে এখানে এসেছে, শান্তি সেনও এখানে রয়েছে। একদিন গভীর রাত্রে শান্তির সাথে একটি রিভালভারের পরীক্ষা চলেছে। রিভালভারটির ভেতর থেকে টোটাগুলি বের করে "ট্রিগার" টেনে পরীক্ষা করবার সময় পল্লীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রচণ্ড শব্দে শান্তির কপাল ঘেঁষে একটি গুলি বের হয়ে গেল। রিভালভারটির ভেতর যে একটি টোটা রয়ে গিয়েছিল, তা লক্ষ্য করা হয়নি বলেই এই অনর্থের সৃষ্টি হল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় পল্লীর ভেতর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এই ঘটনার অবলম্বনে পুলিস অচিরেই যে এসে যাবে তাও নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাসা ছেড়ে যেতে মনস্থ করলাম কিন্তু ফেরারী বন্ধু মাখনলাল কর সেখানে অতি প্রত্যুষে মাল সমেত আসবে বলে আমরা প্রীতিরঞ্জনকে রেখে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়লাম। মাখনলাল করকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় প্রীতিরঞ্জনকে বলি দিতে হল। প্রীতিরঞ্জন তার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করবার জন্য একাকী রইল। আমরা প্রীতিরঞ্জনকে হারালাম।

রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যাবার আগেই শ্যামবিনোদ, দেবপ্রসাদ সেন ও আমি সাইকেল চালিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড় ধরে বেলঘরিয়ার রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। চারিদিকেই লক্ষ্য করে চলেছি—শীতের কুয়াশায় দূরের দৃষ্টিপথকে খানিকটা অস্পষ্ট করেছে—সন্দেহজনক কিছুই পথে দেখা গেল না। অনতিদূরেই বেলঘরিয়ার বাসা। অতি সাবধানে এগোচ্ছি। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, বাসাখানা ভেতর থেকে অস্বাভাবিকভাবে অর্গল-বদ্ধ—বাইরে কোথাও পুলিসের চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সংলগ্ন প্রতিবেশী-গৃহের জানালার ধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক কূলবধূ—উৎকণ্ঠিত তাঁর মুখমণ্ডল। আমাদের দেখে ভেতর দিকে এক পা পিছে হেঁটে হাত নেড়ে বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন—সামনে এগোতে বারণ করার ইংগিত। বুঝতে দেরি হল না, যে পুলিস রাত্রিতেই বাসা ঘেরাও করে প্রীতিকে ধরেছে এবং তারপর দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরেই ওত পেতে বসে রয়েছে, আরও শিকার ধরবার আশায়। যদি কেউ আঙ্গিনা পার হয়ে দরজা ধাক্কা দেয় বা প্রীতিকে ডাক দেয় তবে সঙ্গীন চড়িয়ে ও গুলি ভর্তি রাইফেল নিয়ে বাঙ্গালী, গুর্খা, পাঠান বা হিন্দুস্থানী সিপাহীর দল সবাই ছুটে এসে তাকে "সামরিক" অভ্যর্থনা জানাবে।

অভ্যর্থনার পূর্বেই আমরা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছি। কূলবধূর ইংগিত ব্যর্থ হল না। তাড়াতাড়ি পল্লীর ছোট্ট একটি রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই মাখন করকে পথের ধারে ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে বসে আছে, দেখতে পেলাম। মাখন করের নিকটও অনুরূপ অভিজ্ঞতার বর্ণনা পেলাম—সংলগ্ন গৃহের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে কূলবধূর ইংগিত। প্রায় এক বৎসর পর এক পুলিস গুপ্তচরের মুখে জানতে পেরেছিলাম যে বেলঘরিয়া-ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ স্থলে সশস্ত্র এক পুলিসের দল আমাদের জন্য আড়ালে অপেক্ষা করছিল কিন্তু ধার্মিক মুসলমানের মতো গোঁফ ও দাড়ি রেখে এবং মাথায় পট্টি বেঁধে

দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবার জন্য তারা আমাকে চিনতে পারে নি এবং অপর সাথী বন্ধুদের—শ্যাম বিনোদ ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে চিনবার লোক নাকি সেখানে ছিল না। ঘটনার পর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, কিন্তু সেই বাংলা মায়ের কুলবধূর গৃহের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর জাতীয় কর্তব্য করার ছবিখানি আজও মন থেকে মুছে যায়নি।

বোমা তৈরির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অস্ত্রের জন্যও জোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে, পর্যাপ্ত অস্ত্রের সংস্থান ভিন্ন তা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ পরিকল্পনায় তখন আমরা মন দিয়েছি।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলা ও ভারতের সর্বত্র প্রতিহত হয়েছে, অধিকাংশ সময়ই বিশ্বাসঘাতকতার বালুচরে। বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগ নিখুঁত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের দল সৃষ্টি করেছে। পার্টির ভেতরকার এই বিভীষণদের খোঁজ রাখত—বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগের সবময় কর্তারা। এদের গোপন খাতায় অথবা এদের মনের চোরা-কুঠরিতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নামের ফিরিস্তি থাকত। এই সময় বিপ্লব আন্দোলনের শায়েস্তাকারী নায়েব ছিল, রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। রায় বাহাদুরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা এই পদ অলঙ্কৃত করে গেছে তাদের অনেকেই বিপ্রবীদের অগ্নি-নালিকার মুখে প্রাণ হারিয়েছে। গোয়েন্দা-কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জি ১৯১৬ সালে কলকাতার সদর রাস্তার ওপর বিপ্লবীদের আক্রমণে নিহত হয় (কুমিল্লার অতীন্দ্রমোহন রায় আক্রমণকারীদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত)। গোয়েন্দা-কর্তা ভূপেন চ্যাটার্জি দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দীর্ঘ দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত চট্টগ্রামের প্রমোদরঞ্জন, নদীয়ার অনন্তহরি, হাওড়ার বীরেন ব্যানার্জি ও তাদের অন্য দুই বন্ধু কর্তৃক কলকাতা আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে ১৯২৫ সালে নিহত হয়। প্রমোদ-অনন্ত দেশদ্রোহিতার প্রতিশোধে জীবন দানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তাদের অনেককেই তখন জ্যোতিষী ও গুরুর আশ্রয় নিতে দেখা যেত। জ্যোতিষী ও গুরুতে মিলে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে ভাগ করে নিত। বিপ্লবীদের আক্রমণে তাদের জীবন-দীপ হঠাৎ নিভে যেতে পারে এই ভয়ে প্রচুর সিপাহী সান্ত্রীর ব্যবস্থা করেও তারা নিরাপদ বোধ করত না—তাই গুরু গৃহে তাদের আগমন ও আশীর্বাদের ব্যবস্থা। পার্টির কোনও সভ্য মারফত খবর এল, দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে গুরুর কোনও এক বিশেষ আস্তানায় গোয়েন্দা-কর্তার গোপন যাতায়াত রয়েছে। স্থানটির সন্ধান পাওয়া গেল এবং সশরীরে তাকে ধরে আনবার প্ল্যান হল। তাকে পেলে বাংলার দেশদ্রোহীদের অনেক বড় চাঁইদের খবর পাওয়া যাবে। দরকার হল, যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র এবং উপযুক্ত ও সাহসী লোক। আমরা তার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

উনিশ

বেলঘরিয়ার ঘটনা আসন্ন দুর্যোগের ইংগিত। শক্তি সমাবেশের মাঝখানেই বুনিয়াদের ভিত যেন খসে যাচ্ছে। সংগঠকরা কোনও না কোনও ভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ধনেশ ও প্রীতিকে হারালাম।

টিটাগড় বাসাটি একান্ত পল্লীর মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবুও সন্দেহ এসেছে। বন্ধুরা একদিন সন্দেহজনক একটি লোককে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করল, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। বাসাখানি ছেড়ে দেবার কথা হল কিন্তু অনেকের ধারণা সন্দেহ তেমন গুরুতর নয়।

প্রফুল্ল সেন সবেমাত্র কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংগঠনের ভার নিয়েছেন। গঙ্গার ধারে খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রের অদূরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের নিকট পল্লীবাসীদের একটি খেলার মাঠকে রাত্রিবেলায় কিছুদিন যাবত মিলন-কেন্দ্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করে আসছি—

সেখানে সেদিন দুই জন বন্ধুর আসবার কথা ছিল। শ্যামবিনোদকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও প্রফুল্ল রওনা হয়ে গেলাম। রাত আটটার সময় আমি ও শ্যামবিনোদ দেখা করে খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রে ফিরে এলাম— মাখন কর, সুধাংশুবিমল এবং আরও দু'এক জন ফেরারী বন্ধুরা সেখানে আছেন। প্রফুল্লের রাত দশটার মধ্যেই মিলন-কেন্দ্র থেকে খড়দহ বাসায় চলে আসবার কথা ছিল।

আমরা সবাই প্রফুল্লের অপেক্ষায় বসে আছি। রাত দশটা বেজে গেল তবু প্রফুল্ল এল না। সওয়া দশটার সময় চিন্তিত হয়ে শ্যামবিনোদ প্রফুল্লের জন্য বের হয়ে গেল। হতাশ হয়ে ফিরে এল— প্রফুল্লের সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রফুল্ল নিশ্চয় ধরা পড়েছে। পার্টির নিয়মানুযায়ী কেউ ধরা পড়ে গেলে তখনই সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য জরুরী সাবধানী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যেন সদস্যের গ্রেফতারজনিত ঘটনাকে অবলম্বন করে সংগঠনকে বানচাল করবার সুযোগ পুলিস না পেতে পারে। সদস্যের গ্রেফতারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবার অবকাশ থাকে না। জরুরী কর্তব্য হিসাবে খুলনা গ্রামে চারুবালা দেবীর কাছে সুধাংশুবিমল দত্তকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হল। চারুবালা দেবী (ওরফে কাকীমা) প্রফুল্লের নির্দেশমত একটি বন্দুক তাঁরই ঘরের মাটির তলায় গোপনে রেখে দিয়েছেন ; কাউকেই তিনি এ বিষয়ে জানতে দেন নি—এমন কি তাঁর স্বামী বিজয়বাবুও জানতেন না যে তাঁরই ঘরে একটি বন্দুক রয়েছে। সুধাংশুকে কাকীমা জানতেন এবং তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন। সুধাংশু চাটগার ছেলে, পার্টির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু বৈপ্লবিক চরিত্রের গুণে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহুদিন থেকেই পালিয়ে পালিয়ে সংগঠনের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে সে করে যাচ্ছে চারুবালা দেবীর কাছে গচ্ছিত বন্দুকটি আনবার জন্য রাত্রেই সুধাংশু একটি লম্বা পাশবালিশ বিছানার মধ্যে নিয়ে রওনা হয়ে গেল—বালিশটির মধ্যে বন্দুকটি ভরে সে এক দিনের মধ্যেই খড়দহ চলে আসবে ঠিক হল।

সুধাংশু চলে যাবার পর বোঝার ভারে যেন মনটা স্থানু হয়ে রইল। একে একে সাথীর দল অন্তর্ধান হয়ে যচ্ছে সেই পাষাণ পুরীর মধ্যে যার বক্ষ চিরে আমরা বের হয়ে এসেছি। প্রতিটি সজাগ-মুহূর্ত আমরা ভরে দিতে চেষ্টা করেছি—বিদ্রোহের আয়োজনে। তাকে সম্পূর্ণ করতে প্রাথমিক অনেক কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে কিন্তু আয়োজনের পুরোহিত যাঁরা তাঁদের সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'তে চলেছে।

রাত বারটা, খড়দহ বাসা। সেখানেই রাত কাটাব বলে স্থির করেছি। শ্যামবিনোদকে টিটাগড় বাসায় চলে যেতে বললাম, পারুল সেখানে একাকী রয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা আপত্তি জানাল। খড়দহ-বাসার মালিক আমাদের আনাগোনা দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে—কোনও মেয়ে না থাকবার কারণ বারবার জিজ্ঞাসা করেছে এবং বিশেষ করে প্রফুল্ল সেন নিকটেই ধরা পড়ায় নিরাপত্তার দিক থেকে খড়দহের বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করে তারা আমাকে টিটাগড় বাসায় যেতে অনুরোধ করল—ভোরে সুধাংশুর বন্দুকটি নিয়ে আসবার কথা বললেও বন্ধুরা তাতে রাজী হল না। অগত্যা আমি ও শ্যামবিনোদ টিটাগড় যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

শীতের রাত—তাই আঁটসাঁট করে পোশাক পরে সাইকেল নিয়ে দু'জনই বের হয়ে পড়লাম। শীতের কন্‌কনে হাওয়া গঙ্গার বুক থেকে হিমশীতল স্পর্শ নিয়ে এল—ওপারের বিজলী বাতিগুলো যেন কুয়াশার ঘন আবরণে বন্দী। নদীর বুকে নিঃসীম অন্ধকারের ছাউনী কুয়াশার ওড়নাকে আপন বক্ষে জড়িয়ে আছে। আমরা সাইকেল বেয়ে চলেছি—গভীর রাত। মাঝে মাঝে দু'এক জন বিরল পথযাত্রীকে আনমনা হয়ে চলতে দেখা যায়।

টিটাগড় রেল স্টেশনের নিকট এসে রেল লাইন পার হয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পল্লীর ভেতর পৌঁছে গেলাম। শান্ত পল্লীখানা শীতের নৈশ-নিস্তব্ধতার পরিপূর্ণ ছবি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পল্লী কুটিরগুলির মাঝ দিয়ে অতি সাবধানে আমরা বাসার নিকট পৌঁছতেই

পারুল দরজা খুলে দিল—পারুল জেগেই ছিল। পারুল সন্দেহজনক কোনও লোকের যাতায়াত সেদিনও লক্ষ্য করেনি। আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম—তখন রাত একটা।

সকাল চারটায় উঠেছি। দেবপ্রসাদ ও নিরঞ্জনের সঙ্গে জগদ্দলে ছয়টার সময় দেখা হবার কথা ছিল। রোজকার মতই স্নানাদি সেরে তৈরি হয়ে আমি ও শ্যামবিনোদ সাইকেল হাতে নিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল, বাইরে থেকে সজোরে দরজা ঠেলে ঢুকবার জন্য কারা যেন চেষ্টা করছে। আগন্তুকরা পুলিসের দল। শ্যামবিনোদ বুঝতে পেরেই তাদের ঠেলে দিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। গোলমালের শব্দ কানে যেতেই পারুলও এসে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ও শ্যামবিনোদ গৃহের একতলা ছাদে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। পারুলও লাফ দিয়ে ছাদে উঠে পড়েছে। অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটেনি। কুয়াশা ও অন্ধকারের আবছায়ার ভেতর দেখতে পেলাম, বাসাখানাকে চারদিক থেকেই পুলিস ঘেরাও করে রেখেছে—তিল-মাত্র ফাঁক তার কোথাও নেই—আর অদূরেই কৌতূহলী পল্লীবাসী জনতার ভিড়। শ্যামবিনোদ রিভালভার হাতে নিয়ে দুর্বল স্থানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে এবং পারুল তাকে সাহায্য করছে। গুলি করবার অনুমতি চাইল। সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত করলাম—গুলির ব্যবহার এখানে কৌতুক মাত্র। পুলিসের বেষ্টনী ও জনতার ভিড়কে চূর্ণ করে দিতে একটি মাত্র রিভালভারের গুলি অসমর্থ—যাবার পথ নেই। আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি। রিভালভারটি এখন আমাদের সকলের জীবন নাশ করতে উদ্যত। শুধু মাত্র সঙ্গে পেলেই অনিবার্য ফাঁসির দড়ি নেমে আসবে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্য। শ্যামবিনোদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিভালভারটি দূরে নিক্ষেপ করে দিলাম। তারপর অন্ধকারের মধ্যে শত্রু-ব্যূহের মাঝখানে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম—আমি ও শ্যামবিনোদ। পারুলও কি যেন ভেবে ছাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে—উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমরা বাইরে পড়বার সাথে সাথে অসংখ্য লোক আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জনতা ও পুলিসের হাতে আমরা বন্দী হলাম।

ইতিমধ্যে দরজা ভেঙ্গে পুলিস ঘরে ঢুকে দেখতে পেল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে, এক বিদ্রোহী নারী। পারুল মূল্যবান কাগজগুলোকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। পারুল গ্রেফতার হল। বোমার রাশিকৃত মালমসলা, সামরিক কিতাবাদি, অর্ধ-দগ্ধ কাগজ, ভস্ম সবই পুলিস সংগ্রহ করল। প্রতিবেশী মেয়ে-পুরুষের সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করে পারুলকে নিযে বের হয়ে এল ব্যারাকপুরের ইংরেজ পুলিস-সাহেব। টুপি উঁচু করে পারুলকে সম্মান দেখিযে সে চলে গেল। বিদ্রোহী নারীর প্রতিও সম্মান দেখাতে এরা কুণ্ঠিত হয় না—পদানত জাতির নিম্ন-মানের অপকৃষ্ট অংশের সাহায্যে অত্যাচারের ব্যবস্থা করে নিজেদের শালীনতা এরা রক্ষা করে থাকে।

সকাল সাতটা—টিটাগড় থানায় আমরা বন্দী। শ্যামবিনোদ ও পারুলকে থানার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখেছে। টিটাগড থানা সরগরম হয়ে উঠেছে—পুলিসের অফুরন্ত আনাগোনা। তিন তিনটি ফেরারী আসামীকে একযোগে ধরবার জন্য পুলিসের বাহাদুরীর অংশীদার জুটেছে টিটাগড় বাসাখানার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীর দল। (পরবর্তীকালে তাঁরা দুঃখপ্রকাশ ও অনুশোচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়)।

বিদ্রোহীর জীবন ইংরেজ রাজশক্তির নিকট প্রতি মুহূর্তেই সংশয়াকূল। তবুও তা গৌরবের—অপমানের জ্বালাবোধ তাতে নেই। কিন্তু দেশী লোকের হাতে বন্দীদশা—অপমানের ও দুঃখের। মনে হল, যেন সীতা দেবীর আকুল প্রার্থনার মত ধরণী দ্বিধা হলে এ মর্মান্তিক জ্বালাবোধ থেকে মুক্তি পেতাম অথবা কোনও অশরীরী শক্তির সাহায্যে এই নিকৃষ্ট অংশকে সমূলে উৎখাত করে দিতে পারলে জাতির বীর্যবান অংশকে জিইয়ে রাখতে পারতাম। কবির মানস

কল্পনায় জেগেছিল স্বপ্ন—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—এ আমার জন্মভূমি"। সেই দেশ তখনও জন্মায়নি।

কলকাতা থেকে অফিসারদের আগমন শুরু হল। রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার ও বনবিহারী মুখার্জি গরাদের বাইরে থেকে আমাদের দেখতে এল। চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল অসংখ্য অফিসারদের আনাগোনা। শুধু যেন চোখটাই খোলা ছিল, মনটা কোথায় যেন তলিয়ে গেছে। আমি নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গরাদের ভেতরে বসে রইলাম, সারাদিন একই অবস্থায় কেটে গেল। কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। থানার দারোগাটি ছিল মার্জিত রুচির। গভীর প্রশান্তি দেখে বোধ করি আমার মনের আলোড়ন বুঝতে পেরেছিল—প্রশান্তি ভাঙ্গবার চেষ্টা সে করল না।

সন্ধ্যার সময় পর পর খান তিন চার সশস্ত্র গাড়ি এসে হাজির হল, নিয়ে যাবার জন্য। বাছাই করা গোয়েন্দা অফিসারের দল এসেছে। গরাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার যেন সম্বিত ফিরে এল। মনের ক্লীবত্ব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম—দারোগা যাবার জন্য আহ্বান জানাল। পারুলকেও নিয়ে এসেছে, শ্যামবিনোদও এল। গাড়িতে উঠবার সময় পারুল বলল, দারোগাটি এ পর্যন্ত ভালো ব্যবহারই করেছে—স্নান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

একই গাড়িতে আমরা যাচ্ছি। সশস্ত্র সিপাহী আর গোয়েন্দা-অফিসার দিয়ে গাড়িখানা ভর্তি। প্রত্যেকের দুই পাশেই দুইজন করে সিপাহী। অন্যান্য সশস্ত্র গাড়িগুলি পিছু পিছু আসছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর প্রধান শিবিরে আমরা উপস্থিত হব। শিবিরের পরীক্ষা আমার বহুবার হয়েছে কিন্তু শ্যামবিনোদ ও পারুলের পক্ষে তা নতুন, তাই এদের সাবধান করা দরকার। তার চেষ্টা করতেই পুলিস অফিসারটি প্রাণপণে বাধা দিল, চেঁচামেচি শুরু করল, শেষ পর্যন্ত মারের ভয় দেখাল, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বলে যেতে লাগলাম—"ওরা যাই বলুক না কেন, যত প্রলোভন দেখাক না কেন, এদের একটি

কথারও জবাব দেবে না। এদের হাজার উৎপীড়নের মুখে, এদের বর্বরতার চাপে, এদের কৃত্রিম ভালবাসার কথায় বা দেশাত্মবোধের প্ররোচনায় একমাত্র নিজের পরিচয় ভিন্ন আর কোন খবরই দেবে না।" অনেকবার বাধা পেলেও কথাগুলি বলে যেতে সমর্থ হলাম যেন আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে আমার বন্ধুরা পুলিসের অত্যাচারের কাছে কোমব বেঁধে একত্রে দাঁড়াতে পারে। পারুল ও শ্যামবিনোদের মনের ভেতর ঝড় বইছে। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—এই হতাশার সুযোগ পুলিস নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে—পুলিস বীজাণুর মতো মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের হাতের 'পুতুল' বানাবাব চেষ্টা করবে। আমার সাবধান বাণী শেষ হতেই গাড়ি চলে এল কলকাতা—লালবাজাব থানায়। আমাকে লালবাজার থানায বেখে, পারুল ও শ্যামবিনোদকে নিয়ে গাড়িখানা অন্যত্র চলে গেল।

গাড়ি থেকে নামবার সাথে সাথে হাত দু'খানায় শিকল পরিয়ে দিল। সারিবদ্ধ সার্জেন্ট ও সিপাহী বাহিনীর মধ্য দিয়ে লালবাজাব কয়েদখানার দ্বিতল গৃহে আমাকে নিয়ে গেল। পরিচিত সার্জেন্টেব দল আশে পাশে, তারা অনেকেই আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। কিন্তু একদল সার্জেন্ট মনের ঝাল মিটাবার জন্য বিশুদ্ধ ইংবেজী ভাষায় (ইতব ভাষার গালিকে আমরা 'বিশুদ্ধ' বলে নিজেদের মধ্যে বর্ণনা করতাম) গালি দিতে শুরু করল। তাদেব আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য আমি প্রতি-গালিবর্ষণ শুরু করলাম। আমাকে মারবার জন্য ওরা এগিয়ে আসতেই সার্জেন্ট-ইন-চার্জ ইন্সপেক্টরটি দৌড়ে এল এবং ইতরগুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই আমার দরজার কাছে বসে রইল। এক পেয়ালা গরম চা ('ব্ল্যাক-টি') দিতে চাইল; ধন্যবাদের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিলাম।

হাতের শিকলটি খুলে দিয়েছে। দ্বিতলের বৃহৎ কামরাটির মধ্যে আমিই একক বাসিন্দা। মেঝের ওপর একখানি কম্বল পাতা ছিল।

নিজের গরম চাদরখানা গায়ের ওপর টেনে দিয়ে নির্বাক, নিস্তব্ধ, জড়পিণ্ডের মতো তারই ওপর পড়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে দরজা খোলার শব্দ কানে ভেসে আসছে। পরিচিত গোয়েন্দা অফিসার দুই এক জন এসে নিঃশব্দেই চলে গেল। প্রাণের ভেতর চলেছে ঝড়ের দোলা। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানিবোধ যেন পৌরুষকে খর্ব ও চূর্ণ করে দিয়ে অট্টহাস্যে বিদ্রূপ করছে। অপরাজেয় আদর্শের বাহক আমরা। আমাদের বীর্যবান পূর্ব পুরুষেরা পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার ভেতর দিয়েও ভারতকে স্বাধীন করবার আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, গভীর অন্ধকারের ভেতর। তাঁদেরই পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করে চলেছি। মন আমার শক্ত হল। পরাজয়ের সোপান বেয়ে সার্থকতায় পৌঁছবার চেষ্টা করব।

কুড়ি

পরাধীনতার শৃঙ্খল যারা ভাঙ্গতে চান, জেলের শৃঙ্খল বরণ করে নেবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। লালবাজারের পুলিস হেফাজত থেকে পরের দিন সকাল বেলায় আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হল। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে এল—শৃঙ্খলের সুনিবিড় বন্ধন। লোহার বেড়ি পরিয়ে পা দুটোকে এঁটে দেওয়া হল। দীর্ঘ কয় বছর তারা আমার পায়ে জড়িয়ে ছিল। বন্ধনের কদর্য-কাদায় এর আগেও গতি হারিয়েছি, তখন বন্ধন ছিল সাময়িক কিন্তু এবারের এই বন্ধন হল দীর্ঘস্থায়ী—পীড়নের ক্ষেত্র শুধু মন নয়, সারা দেহটাকে ঘিরে।

থাকবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হল জেলের সুরক্ষিত '৪৪' ডিগ্রি। নানাপ্রকার সতর্কতার ব্যবস্থা হল। ডিগ্রির হিন্দুস্থানী সিপাহীদের ওপর নতুন করে আরও এক প্রস্থ হিন্দুস্থানী ডবল গার্ডের সঙ্গে

ইংরেজ সার্জেন্টদেরও গার্ড বসল। ডিগ্রি ও উপ-ডিগ্রির ছোট আঙ্গিনাটুকুর ভেতরেই স্নান খাওয়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত হল ফাঁসির আসামীর মতো এবং তত্ত্বাবধানের জন্য যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বিশালকায় এক বলিষ্ঠ পাহাড়ী পেশোয়ারী কয়েদী পাহারাদারকে আমদানি করা হল। সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত ডিগ্রি ও আমার দেহটিকে ঘিরে তল্লাশী যেন লেগেই রইল।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আফগান সীমান্ত রেখায় দুর্ভেদ্য "ডুরাণ্ড লাইন" ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারকে রুখে দিয়েছিল। ডুরাণ্ড লাইনের কোলে গিরিমালার বুকে পর্বতের মতো দেহ ও মন নিয়ে যাব জন্ম হয়েছিল তার পক্ষে হুকুমের তাঁবেদার হয়ে নিরীহ মেষ-শাবকের মতো জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য। একদিন সার্জেন্ট-জমাদারের হুকুম মাফিক কাজ করতে পেশোয়ারী পাহারাদারটি অস্বীকার করল। তাকে ওরা তিরস্কার করে মারের ভয় দেখাতেই সে ডিগ্রির সামনেকার ছোট আঙ্গিনাটুকুতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্'র নাম জপতে শুরু করল এবং প্রার্থনা জানাল "খোদা হামকো গোস্সাসে বাঁচাইয়ে। হামারা ছোটা ভাই গোস্সাসে আদ্মীকো মারনে পর কালাপানীমে ফাঁসি হো গয়া।" এইভাবে সে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে চাইল, যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার দেহের প্রচুর শক্তির অপব্যবহার করে কোনও অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষ তখুনি তাকে পাহারাদারীর কাজ থেকে বরখাস্ত করে জেলের অন্যত্র সরিয়ে দিল।

তারই জায়গায় এল বরিশাল নিবাসী দীর্ঘ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত একজন মুসলমান কয়েদী-পাহারাদার। মুসলমান পাহারাদারটি দূর থেকে সব রকম সাবধানী ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করল এবং যাতে সিপাহী সার্জেন্টরা তাকে কোনও ভাবেই সন্দেহ না করতে পারে তার জন্য ডিগ্রি থেকে দূরেই আমার স্নানের জল ও খাবারের থালা রেখে যেতে লাগল। পাহারাদারটির চলাফেরার মধ্যে যেন এক শক্ত মানুষের ইংগিত পেলাম।

অনুমানে মনে হল, ওর গলায় "খোপর"* বানানো রয়েছে এবং সতর্ক চলাফেরা এবং বিনয়-নম্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে "খোপরটিকে" বাঁচাতে চাচ্ছে। একদিন সুযোগমত উপস্থিত সিপাহী সার্জেণ্টদের মুহূর্তের অলক্ষ্যে তার সঙ্গে চোখের ইশারায় ভাব বিনিময় হল। সে সাহায্য করতে রাজী হল। ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে চার পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণের সামান্য এক টুকরা সাদা কাগজ ও দুই ইঞ্চি পরিমাণের পেন্সিলের ভিতরকার এক টুকরা শীষ জেলের অন্যত্র আটক রাজবন্দী-বন্ধুদের থেকে এনে আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজবন্দীরা তখন প্রেসিডেন্সী জেলের একাংশ ভরে রেখেছিল। কড়াকড়ি ব্যবস্থার জন্য তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক করা এক রকম অসম্ভব ছিল। তিন চারদিন পর খাবারের থালা রাখবার সময় একটি আঙ্গুল বাজিয়ে সে চলে গেল। সাবধানে খাবার খেলাম কিন্তু খাবারের ভেতর কোনও জায়গাই ঈপ্সিত জিনিসটি পাওয়া গেল না। কিন্তু গরাদের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে থালা নেবার সময় দুটি আঙ্গুলের মাঝখান থেকে কালো সুতায় জড়ান এক টুকরা জিনিস সবাইর অলক্ষ্যে সে গলিয়ে দিল। সিপাহী-সার্জেণ্টদের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ পর আমি টুকরাটি উঠিয়ে আঙ্গুলের মাঝখানে চেপে রেখে দিলাম। কাগজ ও পেন্সিলের শীষ পাওয়া গেল। রাজবন্দী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হল।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য আবার আলিপুর স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাকে হাজির করা হল। বন্ধুরা ও আমাদের কৌঁসিলী সবাই আমাদের অপ্রত্যাশিত গ্রেফতারে মর্মাহত। তাঁদের চোখ মুখে বেদনা পরিস্ফুট। পরাজয়ের গ্লানিবোধ তাঁদের অন্তরকে মথিত করে বিচারের আসন্ন রায়কে অর্থহীন করে

* গলনালীতে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে অথবা সুতায় বেঁধে সীসা দিয়ে কয়েদীরা নিষিদ্ধ জিনিস তল্লাশীর বাইরে রাখবার জন্য যে ছোট গর্ত করে নেয় তাকেই খোপর বলা হয়।

সাজা হয়। এঁরা পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

(৮) মাদ্রাজ বোমা বিস্ফোরণের মামলা—এই বিস্ফোরণে পার্টির সভ্য ভেঙ্কট রমণ মারা যান এবং একজনের দণ্ড হয়।

(৯) বর্মার ডাকাতি ও সেখানে বিপ্লব প্রসারের প্রচেষ্টা—বীরেন্দ্রচন্দ্র দে ধৃত হন। প্রাথমিক বিচারে তাঁর চৌদ্দ বৎসর সাজা হয় (পরে খালাস পেয়ে বিনা বিচারে আপিলে বন্দী থাকেন)। নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্মাপ্রদেশে উল্লেখযোগ্য ছিল।

(১০) লিউক-শুটিং মামলা—ভোলা রায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সত্যব্রত চক্রবর্তীকে তখন পাওয়া যায়নি।

(১১) হিলি ডাকাতির মামলা—এই মামলায় বিশেষ আদালতের বিচারে চারজনের ফাঁসির হুকুম হয়, তিন জনের যাবজ্জীবন দণ্ড, তিন জনের দশ বৎসর, তিন জনের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টে চার জনের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দণ্ডে পরিণত হয়েছিল, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত চক্রবর্তী, সরোজ বসু ছিলেন ফাঁসির আসামী এবং আবদুল কাদের, প্রফুল্ল সান্যাল, কিরণ দে ছিলেন যাবজ্জীবন দণ্ডের আর বিজয় বানার্জি, রামকৃষ্ণ সরকার, হরিপদ বসু ছিলেন দশ বৎসরের জন্য দণ্ডিত আসামী।

(১২) সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা বহু চিঠিপত্র—অর্থ উদ্ধারের ফলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতার প্রমাণ অধিকতর সহজসাধ্য হয়েছিল।

(১৩) প্রেসিডেন্সী জেল হ'তে পলায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত কাঁকুড়গাছির ফেরারী কেন্দ্রে প্রাপ্ত বিশেষ ভাবে তৈরী সিঁড়ি, মোটর গাড়ি প্রভৃতি।

(১৪) প্রেসিডেন্সী জেল গেটে প্রাপ্ত সঙ্কেতলিপি—বহু জরুরী খবরে চিঠিখানা ভর্তি ছিল।

(১৫) দেউলী বন্দী নিবাসে লেখকের স্যুটকেসে প্রাপ্ত চিঠি—সঙ্কেতলিপি সম্পর্কিত এই চিঠিখানার বলে লেখককে প্রত্যক্ষভাবে মামলায় জড়ান সম্ভব হয়েছিল।

(১৬) বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার মাল-মসলা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত।

(১৭) রাজসাক্ষীদের ও বিভিন্ন অপরাপর সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং অন্যান্য আরও অনেক দলিলপত্র।

(১৮) সত্যেন মজুমদারের নিকট এক হাজার টাকার একখানা নোট প্রাপ্তি—অন্তরীণে যাবার পথে বাক্স তল্লাশী করে নোটখানা পুলিস পেয়েছিল।

আমাদের কৌঁসিলী ব্যারিস্টার শ্রী জে. সি. গুপ্ত ও শ্রীশেখর বসু এবং উকীল বন্ধুরা, শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত, শ্রীপূর্ণেন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীশিশির মৈত্র সাধ্যমত গভর্নমেণ্টের যুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন—বিশেষ করে শ্রী জে. সি. গুপ্ত মহাশয়ের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

এবার রায় দেবার সময় হল।

প্রধান আসামী হিসাবে প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্ত পেলেন যাবজ্জীবন দণ্ড (পঁচিশ বৎসর)। অন্তরীণ আইন ভাঙ্গার অপরাধে তাঁদের পূর্বেই পাঁচ বৎসর করে দণ্ড হয়েছিল—মোট তাঁদের সাজার পরিমাণ হল ত্রিশ বৎসর।

সীতানাথ দে, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও আমাকে একই সাজায় গেঁথে দিল (যাবজ্জীবন দণ্ড—পঁচিশ বৎসর)। নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের চরপাড়া মামলার দণ্ড মিলিয়ে মোট সাজা হল ত্রিশ ছাড়িয়ে। নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বর্মার কার্যকলাপের সাক্ষ্য ও প্রমাণ এনে তাঁর দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিশোরী দাশগুপ্ত পেলেন—দশ বৎসর। পার্টির বিশ্বস্ত সভ্য নোয়াখালী নিবাসী ভূপেন মজুমদার ছিলেন এই মামলার একজন ফেরারী আসামী। তাঁর হস্তলিখিত একখানা চিঠি প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরারী আড্ডায় পাওয়া যায়। পুলিস উক্ত চিঠিখানা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কিশোরীর লেখা বলে প্রমাণ করে এবং ট্রাইব্যুনাল

কিশোরীকে সেই চিঠির বলে দীর্ঘ দণ্ড দেয়। ইতিমধ্যে ভূপেন মজুমদার পলাতক অবস্থায় কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ফরিদপুর, পালং আশ্রমে (স্বর্গীয় জীবন ঠাকুরতা ও আশুতোষ কাহিলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) দেহান্তর করেন কিন্তু পুলিস সে-খবব তখনও জানতে পারেনি।

পরেশ গুহ ও মণীন্দ্র চৌধুরীকেও দশ বৎসর করে সাজা দিল। পরেশ ছিল রংপুরের বিশিষ্ট সভ্য ও সংগঠক এবং বক্সা ক্যাম্পে থাকাকালীন পার্টির উৎসাহী কর্মী। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জেলা সংগঠক যশোদা চক্রবর্তীর পরামর্শে মণীন্দ্র চৌধুরী একখানা চিঠি বক্সা ক্যাম্প থেকে লিখে বাইরে পাঠিয়েছিল, তাতে একটি অস্ত্রের উল্লেখ ছিল। সেই চিঠিখানা প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরারী আড্ডায় পাওয়া গিয়েছিল।

জ্যোতিষ মজুমদার ও বিমল ভট্টাচার্যকে দিল ছয় বৎসব করে। এর পূর্বে অস্ত্র আইনে তাঁদের ও সুরেন ধর চৌধুবীকে পাঁচ বৎসর করে সাজা দিয়েছিল।

তারপর এল পাইকারী হিসাবে সাত বৎসরের সাজার তালিকা। তাতে ছিলেন—হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিবঞ্জন ঘোষাল, হেম ভট্টাচার্য, প্রভাত মিত্র, সুরেন ধর চৌধুরী, দ্বিজেন তলাপাত্র, অমিয় পাল, যতীন চক্রবর্তী ও সত্যেন মজুমদার।

তিন হতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছিলেন,—মেদিনীপুরের অল্প বয়স্ক সুধীর ভট্টাচার্য, প্রবোধ ঘোষ, শ্যামবিহারী শুক্লা ও কুমিল্লার সুধীর ভট্টাচার্য, ইন্দু মজুমদার, সুশীল রায়, অবনী ভট্টাচার্য, ভোলানাথ দাস অজিত বসু। পরে হাইকোর্ট বিচারে অজিত বসু খালাস পেয়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন।

খালাস পেলেন—লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা (ওরফে পণ্ডিতজী), জ্যোতি-মুকুল ঘোষ, সঞ্জীব মুখার্জি, বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন রায়, রবীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ডাঃ *বিনয় সেন*।

গভর্নমেণ্টের ঝানু প্রসিকিউটারের দল—নগেন ব্যানার্জি, গুণেন

সেন, বি. সি. নাগ প্রমুখের এবং কুটিল চক্রান্তকারী পুলিস দলের মন্মথ সেন প্রমুখের যুক্তি ও চক্রান্তকে খণ্ডন করবার জন্য আমাদের কৌসিলীরা তাঁদের মণীষা উজার করে দিয়েছিলেন—পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য না পেয়েও। বিদেশী শাসকের অন্যায় প্রচেষ্টার মুখে তাঁরা সাহসের সঙ্গে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন—ঐ সময় পুলিসের কোপানল থেকে কেউ বড় একটা রক্ষা পেত না।

মামলায় অর্থ সাহায্য ও তদবীর করবার জন্য আমাদের অনেকেরই পরিবারস্থ লোকদের পুলিসের হাতে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় আমার ছোট ভ্রাতা ধীরানন্দ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিমলানন্দ দাশগুপ্তকে হয়রানি বন্ধ করবার জন্য আমি বিশেষ আদালতের শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম।

হিলি মামলার আসামীদের সমর্থন করবার জন্য দিনাজপুরের শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু ও হিলির উকীল শ্রীবরদা চক্রবর্তীকে শুধু হয়রানি ভোগ করতে হয়নি, পুলিস তাঁদের শেষ পর্যন্ত বিনা বিচারে আবদ্ধ করেও রেখেছিল।

আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা শেষ হল। দীর্ঘ দুই বৎসরের মিলন-স্থান ছিল—বিচারালয়ের কাঠগড়া। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

একুশ

এবার সাজা খাটবার পালা।

বাংলার সেণ্ট্রাল জেলগুলো বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহী তখন হয়ে উঠেছিল—কসাইখানার নামান্তর। একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আন্দামান কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ ও অধীরতা সঙ্গে সঙ্গেই এসে যেত। এ সব জায়গায় বিপ্লবী-বন্দীদের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হত, তাতে নরকের

বর্ণনাও ছোট হয়ে যেত। বাংলার পুলিস ও জেল কর্তৃপক্ষের সেই হীন অত্যাচারের এবং মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা সমূহের কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। অপমানে, লাঞ্ছনায়, বর্বরতার সীমাহীন বিস্তারে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল মূল্যহীন। প্রতিটি দিন ছিল অজানা-আশঙ্কায় ভরা; প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল—জল্লাদ-মুহূর্ত।

শীঘ্রই একদল বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল, মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে—কসাইখানাগুলোর অন্যতম প্রধান-কেন্দ্র। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের প্রসিদ্ধ "দুইশত ডিগ্রি" নামে পরিচিত প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে বিপ্লবীরা বন্দী—ডিগ্রিগুলি সারিবদ্ধ ভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আলো-বাতাস-হীন গুমোট অন্ধকারের ভেতর মনের আলো জ্বালিয়ে বিপ্লবী বন্দীরা চরম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে দিন গুণছে। কুখ্যাত জেলার হরেন সেন ও ডেপুটি জেলার অবনী রায় ও ভারতীয় আই. এম. এস. সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গুলো অনেকেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে খুশী করবার জন্য সদা-তৎপর। নামমাত্র সুযোগের অছিলায় মাঝে মাঝে লাঠি-সোটা নিয়েও তারা আক্রমণ করছে, আবার কাউকে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিপ্লবীদের তাজা খুনের ফোয়ারা ছুটিয়ে প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে। তবুও বিপ্লবীদের জীবন চলেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তাঁদের প্রাণের ওপরও আক্রমণ হবে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন মামলার অমূল্য সেন, হরিপদ দে, জ্যোতিষ মজুমদার, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজয় ব্যানার্জি, পরেশ গুহ, কালী ব্যানার্জি, কালী চক্রবর্তী (ময়মনসিং), সুরেশ দে, দুর্গা সিং, ভবেশ তালুকদার, মণী মুখার্জি প্রভৃতি অত্যাচারের মরশুম ভোগ করছে। আলিপুর জেল থেকে পালাবার পর সারা বাংলার জেলগুলিতে যে অত্যাচারের বন্যা শুরু হয়ে গেল, তাতে দল নির্বিশেষে প্রতিটি বিপ্লবী সভ্যই তার ভাগীদার হয়েছিল—প্রত্যেকের পায়ের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ন্যূনতম এক জোড়া করে লোহার বেড়ি।

বেত্র দণ্ডের সম্য অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রাচীন বিপ্লবী ননী মুখার্জি ও স্থরেন সরখেল সেখানে আছেন। সূর্য সেনের তখন ফাঁসি হয়ে গেছে। তাঁকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মাতা ও ছেলে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে সাত বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড নিয়ে বন্দী। ছেলে রামকৃষ্ণ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে জেলের হাসপাতালে নামমাত্র চিকিৎসাধীন আছে। তাঁর পা ছু'খানাতে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুর্বল শরীর লোহার ডাণ্ডা বইতে পারছে না। মা রুগ্ন ছেলেকে একবার দেখবার জন্য জেলের ছোট বড় সাহেবদের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন, কিন্তু তারা পাষাণ-প্রাচীরের মতোই অটল।

ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের মাত্রা দেখে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন যে খুব শীঘ্রই তাঁদের জীবনের ওপর আক্রমণ হবে, তাই তাঁরা নিজেদের প্রকোষ্ঠের বাইরে যেতেন না যাতে ওরা সুযোগ পেয়ে কোনও অছিলায় আক্রমণ করতে না পারে। তবুও ওরা সুযোগ করে নিল এবং আক্রমণ হল। জেলের সিপাহীর দল নির্বিচারে মাথা সই করে লাঠি চালাতে শুরু করল। আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায় রইল না। অমূল্য সেন তাঁর বলিষ্ঠ হাত দিয়ে নিজের মাথা বাঁচিয়ে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে জবাব দিতে শুরু করলেন—ছ'চার জনকে ধরাশায়ী করলেন কিন্তু সমগ্র সিপাহী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। অমূল্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইল—অপরাপর বন্ধুরাও সবাই গুরুতর ভাবে আহত। অমূল্যর সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে এল জেলের হাসপাতালে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখবার জন্য—যেন আইনের কাছে জল্লাদদের সঠিক পরিচয় সে দিয়ে যেতে পারে। জল্লাদদের দল তার শেষ কথা শোনবার জন্য সংজ্ঞাহীন দেহটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী ?"—অমূল্য সেন বেঁচে গেলেন। দীর্ঘ কাল পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর পাশে বসে আছে শীর্ণ দেহ নিয়ে যক্ষা রোগাক্রান্ত রামকৃষ্ণ—ডাণ্ডাবেড়ির ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। ক্ষীণ কণ্ঠে

অমূল্য সেনকে ভরসা দিয়ে সে আবার চলে গেল তার নির্দিষ্ট শয্যায় হামাগুড়ি দিয়ে, পায়ের শিকল টেনে-টেনে মৃত্যুপারের যাত্রী—সান্ত্বনা দিতে এসেছিল তারই সতীর্থকে। অমূল্য সেন রক্ষা পেলেন ভাঙ্গা হাত ও ভাঙ্গা মাথা নিয়ে, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবন-দীপ অচিরেই শেষ হয়ে এল। কাটারিয়া তখন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বিপ্লবী বন্দীরা সবাই তাকে অনুরোধ করল—মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকে দেখবার মাতার আকুল প্রার্থনা যেন তিনি মঞ্জুর করেন এবং তার পা' দুখানাকে ডাণ্ডাবেড়ি থেকে মুক্ত করে দেন, কিন্তু তিনি তাদের আবেদন না-মঞ্জুর করলেন। রামকৃষ্ণের জীবন-দীপ নির্বাপিত হল—শোকাতুরা মাতাকে মেয়েদের "ডিগ্রি" থেকে নিয়ে এল সন্তানকে দেখবার জন্য—সন্তান মৃত কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ির নিবিড়-বন্ধন তখনও জীবন্ত হ'য়ে রয়েছে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নারকীয় ও হৃদয়হীন ব্যবহারের একটি উৎকট দৃশ্য—ভারত-মাতার বন্ধন-দশার এক অপূর্ব চিত্র রামকৃষ্ণ তার দেশবাসীকে দিয়ে গেল।

নিরঞ্জন ও আমাকে মফঃস্বলের অত্যাচার-কেন্দ্রে পাঠাবার সুযোগ কর্তৃপক্ষ পেল না। টিটাগড়কে কেন্দ্র করে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম ও ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আর এক দফা আমাদের আসামী হ'তে হবে।

নিরঞ্জনের পায় ডাণ্ডাবেড়ি পরান হয়েছে। তারও মাথায় লাল টুপি চড়েছে (পলাতক আসামীদের পৃথক করে দেখবার কারা ব্যবস্থা)।

অস্ত্র-আইনের অপরাধে আমাদের সাথে রাখবার জন্য নিয়ে এল আরও দুইজনকে—রমেশ ও তারাপদ। সে-সময় অস্ত্র পেলেই সন্ত্রাসবাদী বলে গণ্য হ'ত অন্য কোনও বিচার হ'ত না। তাদেরও বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল কিন্তু তা' ছিল অনেকটা হালকা ধরনের শিকল-বেড়ি নামে পরিচিত—চলাফেরা করতে তাতে অনেকটা সহজ হত।

একবার এল বিদেশী পাঁচজন. নৈনিক নাবিক। তারা কলকাতায়

ডকে চড়া দামে রিভালভার বা পিস্তল বিক্রি করতে নেমেছিল—মাল সমেত পুলিস নাকি তাদের ধরেছে। লর্ড সিংহার পুত্র—এস. কে. সিংহা ছিলেন তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (১৯২২ ইং সালে রেল ও স্টীমার ধর্মঘটের সময় স্বর্গীয় জে. এম. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চালিয়ে 'নাম' করে-ছিলেন)। সন্ত্রাসবাদীদের বিচারে বা অস্ত্রপ্রাপ্তির মামলায় তাঁর নিকট হ'তে কোনও উদারতা বা ক্ষমার প্রত্যাশা ছিল না। বিচারে দেশী-বিদেশী বা অজ্ঞতা-বিজ্ঞতার কোনই প্রভেদ তিনি করতেন না। "কলোনিয়েল" (ঔপনিবেশিক) মন এবং ইংরেজের ম্যাগনা-কার্টা বিবর্জিত মেজাজ নিয়ে হতভাগ্য চৈনিকদের তিনি বিচার করলেন। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সাত বৎসর কারাদণ্ড নিয়ে তারা আমাদের কারা প্রতিবেশী হয়ে এল।

আমাদের কড়াকড়ি ব্যবস্থাগুলো সবই বজায় আছে, তবুও তার মধ্যে খানিকটা শিথিলতা এসেছে। আধ ঘণ্টা করে ডিগ্রি-উপ-ডিগ্রির বাইরের আঙ্গিনায় বেড়াবার অনুমতি হয়েছে। আঙ্গিনার এক ভাগ নিরঞ্জন, রমেশ ও তারাপদের জন্য আর এক ভাগ আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের পরস্পর কথাবার্তা ও মেলামেশা নিষিদ্ধ। **Equator** বা বিষুবরেখার মতো এই ভাগকে মনে রাখতে হ'ত। **Equator** আছে অথচ দাগ নেই, তেমনি আঙ্গিনার মাঝখানটা আছে কিন্তু চিহ্ন নেই। দু'দল প্ল্যান করেই হোক বা স্বাভাবিক ভাবেই হোক দু'দিক হতে এসে মিলে যেতাম। পাশের ডান-বায়ের সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে চলত, তারা খট্ করে বুটের আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দিত—আর এগোবেন না অর্থাৎ আমরা সীমানায় এসে পরেছি। আমরাও ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ করে ডাণ্ডাবেড়ি নিয়ে ঘুরে যেতাম। এই সময় চীনা নাবিকদের সঙ্গে দেখা হ'ত। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তাদের মনের কথা প্রকাশ করত—যাকে **Pigeon English** বলা হয়। তাদের বয়স অনুমান করা কঠিন ছিল

তবুও একজনের কথায় বুঝে নিলাম যে তার বয়স প্রায় ষাটের মতো হবে।

সে-সময় প্রেসিডেন্সী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের আরও বেশী করে শায়েস্তা করবার জন্য সুদূর সিন্ধুদেশ থেকে আরউইন ষাড়ের মতো (Irwin Bulls) এক জোড়া আই. এম. এস. পর পর আনবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমটির নামের পদবী ছিল কাটারিয়া আর দ্বিতীয়টির পদবী ছিল বালিগা। ইংরেজ সার্জেণ্টরা নিজেদের গলা দেখিয়ে কাটারিয়ার বর্ণনা দিত—Cutter অর্থাৎ গলা-কাটা আদমী। তার নিত্য নতুন অত্যাচারের স্বরূপ দেখে একজন সাধারণ প্রবাসী বাঙালী কয়েদী (পশ্চিমের জেল থেকে বাংলায় মেয়াদের অবশিষ্ট অংশটুকু খাটবার জন্য তাকে তখন এনেছিল) অনুমান করে বলেছিল যে কাটারিয়া সাহেব নিশ্চয়ই সিন্ধুর অধিবাসী কারণ তার কারা অভিজ্ঞতায় দেখেছে ভারতে নিষ্ঠুরতম অপকার্যের স্থান হল সিন্ধু-প্রদেশ—সে তারই উপযুক্ত সন্তান। জেলের সমস্ত কয়েদী এমন কি অধীনস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত তার অত্যাচারে ও খামখেয়ালীতে অস্থির হয়ে পড়েছিল।

দৈনন্দিন কাজের চাপ এমনিতেই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল কিন্তু কাটারিয়ার আগমনে তা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খেটেও আমরা কেউ নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতাম না—নিরঞ্জন আমার চেয়ে কাজ বেশী দিত কিন্তু আমি তো অর্ধেকটার বেশী দিতে পারতাম না। কাজ কম হলেই, রাত্রির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হ'ত—হাত দু'খানায় শিকল পরিয়ে দিত। অর্থাৎ হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘুমোতে হ'ত। তা' ছাড়াও জেলে হরেক রকম সাজা দেবার ব্যবস্থা ছিল। দিনের বেলায় যে সব রকমারি সাজার ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে একটি হল দেয়ালের গায় লাগান লোহার কড়ার সাথে হাত দু'খানাকে শিকল দিয়ে এঁটে ডাণ্ডাবেড়ি সহ সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখা। আর এক রকম হল

ডাণ্ডাবেড়ি খুলে নিয়ে দু'পায়ের পাতার ওপরকার গাঁটে দুইটি লোহার কড়া পরিয়ে এক ফুট পরিমাণের একটি লোহার ডাণ্ডা কড়া দুইটির সঙ্গে এঁটে দেওয়া, যেন পা দু'খানার মধ্যে এক ফুটও ফাঁক না থাকে এবং যাতে চলবার সময় তিন চার ইঞ্চির বেশী একবারে এগোতে না পারে। শোবার সময় বা মলমুত্র ত্যগ কববার সময় এই ধরনের বেড়ি খুবই কষ্টকর হ'ত—এর চলতি নাম, 'আউলা বেড়ি' আর ইংরেজী নাম cross-fetters।

ডাণ্ডা বেড়ি, আউলা বেড়ি বা হাতের শিকলে মানুষটির চেহারা বা "শিকলের" পরিবর্তন তেমন হ'ত না কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে অদ্ভুত করে দেখাবার ব্যবস্থাও ছিল। কতগুলি চট কাপড় সেলাই করে জাঙ্গিয়া, টুপি, কোর্তা বানিয়ে দিত এবং তা পরতে হ'ত। গরমের দিনে এই পোশাক একেবারেই অসহনীয় ছিল। খাবারের ব্যবস্থার ভেতরেও সাজা দেবার অপরূপ এক বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা ও তরকারির সরকারী নির্দিষ্ট বরাদ্দ রয়েছে। সেই বরাদ্দ চাল, ডাল, তরকারি ইত্যাদি। সাজা-প্রাপ্ত কয়েদীকে অনেক সময় আলাদা করে পাক করে খেতে বলা হ'ত এবং পাক করবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ঢেলা কয়লাও তাকে দিত। তার ওজন হ'ত আধপোয়া। আর সিগারেটের কৌটার মতো একটি ছোট্ট কৌটাকে চুলোর মতো করে ব্যবহার করবার জন্য দিয়ে যেত একটি ম্যাচের কাঠিসহ, যাতে কয়েদী নিজের বাটিতে সব রান্না করে খেতে পারে (একটি বাটি আর একখানা থালা তার বাসনপত্রের যা'কিছু সম্বল) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ তাকে খেতে হ'ত।

চীনদেশীয় লোকেরা সাধারণত খাটুনিতে পরাজিত হয় না। এবার তারাও পরাজিত হল। আমাদের মতোই চরকা ঘুরিয়ে দু'তিনটি সূতাকে একত্রে করে পাকিয়ে দেওয়ার কাজ তাদেরও দিয়েছে, কিন্তু সারাদিন খেটেও তারা ছাব্বিশ আউন্স সূতাকে পাকাতে

পারছে না। সে সময় এক বুড়ো ইংরেজ ছিল, ডিপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট। তিনি ছিলেন কাজ দেবার মালিক কিন্তু কাটারিয়া সাহেব তাঁকে শুধু কাজ বুঝে নেবার মালিক বানিয়েছে। কেন কাজ পূরা হচ্ছে না, জানবার জন্য তিনি আমাদের অফিসে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে সব খুলে বলতে, তিনি আঙ্গুল দিয়ে কাটারিয়া সাহেবের আফিসটা দেখিয়ে চুপ করে রইলেন।

বুড়ো চীনা ও অন্যান্য চৈনিক নাবিকদের সবারই ভাগ্যে জুটেছে সাজা—দিনের পর দিন। ভাঙ্গা ইংরেজীতে বুড়ো তার মনের দুঃখ প্রকাশ করত। তার দণ্ডের কথা মনে হলে সে কেঁদে ফেলত আর বলত—**Catch Police, Magis seven years—India dog. Here work kill finish,** অর্থাৎ পুলিস ধরেছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাত বৎসর সাজা দিয়েছে, ভারতবাসী (অর্থাৎ যারা সাজা দিয়েছে) কুত্তার মতো —এখানে কেবল কাজ আর মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

ইংরেজ সার্জেণ্টদের আমাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই সাবধান করে দিয়ে বলত, **"No Talk English, Eat India, Eat China, Eat All,"** অর্থাৎ ভারত খেয়েছে, চীন খেয়েছে, সবই খেতে চায়—ওদের সঙ্গে কথা বলবে না।

বুড়োর লণ্ডনে এক ইংরেজ-পত্নী ছিল, আর ছিল চীন দেশে তার চৈনিক-পত্নী; নাবিকের জীবনের আলোক-স্তম্ভ। তাদের কথা বলবার সময় সে চোখের জল ফেলত। মাঝে মাঝে তাদের খবর পাবার আশা নিয়ে চীয়াং-কাই-সেখের কলকাতার দূত (কন্সাল)-এর সঙ্গে জেলের গেটে দেখা করত আর ফিরে আসত বিমর্ষ হয়ে, বলত—**No News China London Give News How get Pistol—Dog-Dog-Dog**—কন্সাল চীনদেশের বা লণ্ডনের কোন খবরই দেয় না—কেবল সে জানতে চায়, কোথা থেকে পিস্তল পেয়েছি, কুত্তা কুত্তা ইত্যাদি। হাড়ভাঙা খাটুনি, নিকৃষ্টতম খাবার, নির্যাতন ও আলো-বাতাসহীন সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করার ফলে বুড়োর স্বাস্থ্য ভেঙে

পড়ল এবং গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তাকে জেল হাসপাতালে নিয়ে গেল। একদিন খবর পেলাম, বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। চীয়াং-এর রাষ্ট্রদূতের ওপর ভার—তার পত্নীদের নিকট খবর পাঠান। দীর্ঘকাল ধরে তারা হয়তো তার খবরের আশায় অপেক্ষা করেছে,—সমুদ্রের ধারে বা মাঠের দিকে চেয়ে—কিন্তু তারই দেশের রাষ্ট্রদূত যে ব্রিটিশের গুপ্তচর! পথ চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও তারা খবর পেয়েছিল কিনা, সন্দেহ!!

বাইশ

টিটাগড়ে ধরা পড়বার পর গভর্নমেণ্টের পক্ষে মামলা চালাবার ভারপ্রাপ্ত পুলিস-কর্মচারী মন্মথ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি দিলাম। মন্মথ সেন জেলে এসে দেখা করল। তার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য ছিল—টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও সাক্ষ্যসাবুদের বলে নতুন করে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধোদ্যমের প্রচেষ্টার মামলা যখন সুনিশ্চিত তখন দলকে বাঁচাবার জন্য মামলাকে সংক্ষেপ করে দেওয়া। তাকে প্রস্তাব দিলাম, যদি বেশী লোককে না জড়িয়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও সাক্ষ্যসাবুদের বলে টিটাগড়ে ধৃত তিনজনকে নিয়েই মামলা করাবার জন্য সে গভর্নমেণ্টকে রাজী করাতে পারে তবে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম ও ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি স্বীকার করে নেব এবং তার জন্য মৃত্যুদণ্ডও নিতে আমি প্রস্তুত থাকব। পারুল ও শ্যামবিনোদকে যথাক্রমে দশ বৎসর ও যাবজ্জীবন দণ্ড নেবার জন্য আমি রাজী করাতে চেষ্টা করব। মন্মথ সেনের কথায় মনে হল, সরকার পক্ষ মামলা সাজাবার কাজে অনেকখানিই অগ্রসর হয়েছে। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মামলার গোড়ার কথা হল, স্বীকারোক্তি। সে দিক দিয়ে পুলিস হয়ত বিশেষ সুবিধা করতে পেরেছে, যার জন্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হল না।

কিছুদিনের মধ্যেই সনাক্ত করবার হিড়িক পড়ে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এনে সনাক্তকরণ অভিনয় শুরু হল। সনাক্ত করবার সারিতে কিছু সংখ্যক ভদ্রবেশধারী লোকের মধ্যে আমাকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হ'ত। বাইরে থেকে যারা আসত অর্থাৎ সাক্ষীরা সারির সামনে এসে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। পুলিস তাদের আগে থেকে ফটো দেখিয়ে অথবা চেহারার বর্ণনা দিয়ে বা অন্য কোনও ইংগিত দিয়ে এমন করে প্রস্তুত করত যে তারা সাধারণত ভুল করত না। কিন্তু একদিন একটি লোক ভুল করে বসল। সামনে এসেও আমাকে সঠিক ভাবে ধরতে না পেরে, আমার নিকটস্থ দুইজনকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল আমাকে দেখাবার জন্য (বোধ করি কোন ইংগিত পেয়ে)। কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত সার্জেণ্ট এডওয়ার্ড দৌড়ে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং সনাক্ত করবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলল যে এটা সম্পূর্ণই বে-আইনী, কারণ দ্বিতীয়বার কেউ সারিতে ফিরে আসতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেটও তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

আবার আলিপুর কোর্টেই টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হল। ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন তিনজন—কে. সি. দাসগুপ্ত, আই. সি. এস (পরবর্তী কালে সুপ্রিম কোর্টের জজ্), মিস্টার বিভার আই. সি. এস. ও মিস্টার এন. কে. বসু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রোসিকিউটার, জে. সি. মুখার্জি (ইতিমধ্যেই নগেন ব্যানার্জি মারা গেছেন), বি. সি. নাগ প্রভৃতি, আর আমাদের পক্ষে ছিলেন, ব্যারিস্টার জে. সি. গুপ্ত ও শেখর বসু, এডভোকেট শ্রীমন্মথনাথ দাস, পূর্ণেন্দ্র রায় চৌধুরী, সুকুমার দাশগুপ্ত ও শিশির মৈত্র। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন বিভার।

মামলাকে সাজিয়ে গুজিয়ে যাতে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য ছিল সরকার পক্ষে কুটিল চক্রান্তকারী পুলিস-উপদেষ্টা মন্মথনাথ সেন।

বত্রিশ জনকে আসামী করা হল। বেলঘরিয়া বাসায় ধৃত, সিলেটের প্রীতিরঞ্জন ছিল, প্রথম আসামী। তারপর আমরা সবাই—প্রফুল্ল সেন, ধনেশ ভট্টাচার্য, পারুল মুখার্জি, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন সেন, সুধাংশু বিমল দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, মাখনলাল কর, রবীন্দ্র ঘোষ, বিভূতি ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, জগদীশ ঘটক, কালীপদ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্র মুন্সী, ধীরেন্দ্র ধর, কার্তিক সেনাপতি, অজিত মজুমদার, দেবব্রত রায় (সিলেট), জীবন দে, জুড়ান গাঙ্গুলী, জীবন ধুপী, বীরেন বসু, সীতানাথ দে, সন্তোষ সেন (রাজসাক্ষী), বিজয় পাল চৌধুরী (রাজসাক্ষী), সুনীল বসু (রাজসাক্ষী)।

বিপজ্জনক রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়াল সন্তোষ সেন। তার স্বীকারোক্তির ফলে দক্ষিণ বাংলার সংগঠন, বিশেষ করে বরিশাল ও খুলনার—প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং বহু পার্টি-সভ্য ও দরদী ধরা পড়ে গেল। পার্টির দরদী সভ্য ও শিক্ষক শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করল এবং খুলনার কাকীমা এবং তাঁর স্বামী বিজয় বসুও গ্রেফতার হলেন। কাকীমার ছেলে সুনীল ছিল পার্টি সভ্য। পুলিসের চাপে এবং মা ও বাবাকে বাঁচাবার জন্য সে শেষ পর্যন্ত রাজসাক্ষী হ'য়ে দাঁড়াল। সন্তোষ সেনের স্বীকারোক্তির ফলে লুকোন বন্দুকটির সন্ধান করতে গিয়ে তাদের বাড়িখানা পুলিস চষে একাকার করে দিয়েছিল। ফরিদপুরের বিজয় পাল চৌধুরীও রাজসাক্ষী হ'য়ে দাঁড়াল।

বিপ্লবীদের পক্ষে সামান্যতম স্বীকারোক্তিও দূষণীয়। শুধু যে বৈপ্লবিক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব তাতে প্রকাশ পায় তা নয়, তাতে সংগঠনের যে বিপুল ক্ষতি হয়ে থাকে তা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মারের চোটে, অথবা মারের ভয়ে বা নিজের শাস্তিকে লঘু করবার আশায় স্বীকারোক্তি করার উদাহরণ সকল বিপ্লবী মামলাতেই ছিল তা' থেকে আমাদেরও অব্যাহতি পাবার কথা নয়, কিন্তু প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাজসাক্ষী তো দূরের কথা সাধারণ

স্বীকারোক্তিও আশা করা যায় না। সন্তোষ সেন ছিল সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত। তাই তার রাজসাক্ষী হবার ফলে বিষম ক্ষতির কারণ হল।

রাজসাক্ষীদের বাদ দিয়ে কোর্টের ডকে ডকে একত্রিত হবার পর জানা গেল, পুলিসের অত্যাচারের হাত থেকে কেহই বড় একটা রেহাই পায় নি। এমনকি নারী আসামীও তার হাত থেকে রক্ষা পায় নি। ধরা পড়ার পর পারুলকে পুলিস হেড-কোয়ার্টারস-এ নিয়ে গিয়ে কুখ্যাত গোয়েন্দা অফিসার সন্তোষ গুপ্তের হাতে অর্পণ করা হয়। অকথ্য বর্বর ভাষাব তূণগুলি নিক্ষেপ করেও যখন সে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় কবতে পারল না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে পারুলকে উৎপীড়নের জন্য ছুটে গেল। পারুল চীৎকার কবে ও জুতা ছুড়ে আত্মরক্ষাব চেষ্টা কবছে কিন্তু রুখতে পারছে না। এমনি সময় চীৎকার শুনে পার্শ্বস্থ জনৈক গোয়েন্দা অফিসাব ছুটে এসে অবস্থা দেখে সন্তোষ গুপ্তকে সাবধান করে বলল, "আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছেন না, আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে"। ভয় পেয়ে সে নিবস্ত্র হল—পারুল জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেল।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারের সাথে সাথে মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে থাকে যার ফলে শান্তি, সুনীতি, প্রীতিলতা ওয়েদেদ্দার, উজ্জ্বলা ও বীনা দাসের কর্ম-কীর্ত্তিতে বাংলার বিপ্লব-ভূমি মুখর হয়ে উঠেছিল। বৈপ্লবিক আন্দোলনের এই সম্মিলিত সংগ্রামকে বাধা দেবার কোনও সহজ পথই পুলিসের ছিল না। একমাত্র হীন-প্রচার ও পাশবিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

আমাদের দুইজনকেই—নিরঞ্জন ও আমাকে কোর্ট ছুটির দিনগুলোতে পুরা খাটুনি দিতে হ'ত। মেদিনীপুর জেলকে শায়েস্তা করে কাটারিয়া তখন সবেমাত্র প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে

এসেছে। কলকাতার জেলে, এই তার প্রথম পদার্পণ। অল্পদিনের মধ্যেই জেলখানা গরম হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্সী জেলে (পুরানা জেল নামে পরিচিত) বাংলার ও ভারতের বহু জায়গা থেকে দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীদের এনে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। জেলের কড়া নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়েও তারা তাদের জীবন যাত্রার উপযোগী ব্যবস্থা করে নিত। নিষিদ্ধ জিনিস যথা, চড়স, আফিং, তামাক, বিড়ি, কোকেন, সবই সেখানে পাওয়া যেত কিন্তু বাজার দরের উঠানামা ছিল—তামাকের দর ছটাক এক টাকা হতে দুই টাকাও হতে পারত। কাটারিয়া সাহেব আসবার পর থেকেই দর বেড়ে গেল, এমনকি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। নানা অছিলায় জেলখানার শাস্তিমূলক কুঠুরিগুলি ভরে গেল। কয়েদীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এমনকি স্বভাব-দুর্বৃত্ত কয়েদীদের গলার ভিতরকার খোপরটি তল্লাশী করে নিষিদ্ধ জিনিস বের করবার চেষ্টাও হ'ত—গলা টিপে শ্বাসরোধ করে। যদি সক্ষম না হ'ত, তবে কম্বল-ধোলাইর ব্যবস্থা করত অর্থাৎ কম্বল দিয়ে কয়েদীর দেহকে জড়িয়ে নিয়ে ওপর হতে পিটান হ'ত যেন গায়ে কোনও দাগ না পড়ে। এ সব দেখেই সার্জেণ্টরা ওর নাম দিয়েছিল 'কাটার' (Cutter).

চুয়াল্লিশ ডিগ্রির উঠোনটার খালি জায়গাটুকুর মধ্যে বিকেল বেলায় নিয়ম মতো একদিন আধ ঘণ্টা বেড়াবার জন্য আমায় নিয়ে এল—সিপাহী দুইজন দুই পাশে রয়েছে। গরমের দিন। নিরঞ্জন, রমেশ ও তারাপদ বড় প্রাচীরের সংলগ্ন জলের কলটিতে স্নান করতে যাচ্ছে দেখে পাহারারত সিপাহী আপত্তি করল কিন্তু ওরা কেউ তার আপত্তিতে কান দিল না। ওদের গালি দিচ্ছে দেখে, সিপাহীটিকে সংযত ভাষায় কথা বলতে বললাম কিন্তু সে তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিপাহীটি ছিল পাঠান, তাকে ধমক দিতেই সে যেন বর্বরতার উন্মত্ত বন্যা ছেড়ে দিল। তার গালি আমার অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী করে তুলল এবং ডাণ্ডা-বেড়ি নিয়েই আমার দুই সিপাহীর বেষ্টনী ভেঙ্গে ওর উপর

ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে জামা কাপড় নিয়ে নিরঞ্জন, রমেশ এবং তারাপদও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘা মেরে বর্বরতার জবাব দিতেই আমার পার্শ্বস্থ সিপাহীরা পাগলা বাঁশী বাজিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলের চারদিক হতেই বাঁশী বেজে উঠল। সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করে নিরঞ্জনকে তার সেলের ভেতর ঠেলে দিয়ে আমিও আমার সেলের দিকে দৌড়ে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট ওক্শট সাহেব অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দৌড়ে এসেই সজোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেলের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাটারিয়াও তখুনি এসে হাজির হল—উন্মত্ততার ছাপ তার চেহারায়। আমাকে সেলের ভেতরে অর্গল-বদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জেন্ট ওক্শটকে ভর্ৎসনা করে বলল, "ওকে মেরে ফেলবার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। ওকে যদি ঢুকতে না দিতে তবে বাইরেই অনায়াসে আজ আমরা গুলি করে মেরে ফেলতাম, তাতে এক কলম মাত্র লাল কালি আমার খরচ করতে হ'ত"। কথাগুলি শুনে আর ওর অসভ্যতা দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না। সেলের ভেতর থেকেই বুক পেতে দিয়ে বললাম,—"সাহস থাকে তো গুলি করে এখুনি আমাকে হত্যা করো—চেঁচামেচি আর অসভ্যতা করো না।" তবুও খানিকক্ষণ ধরে সে চেঁচামেচি করল এবং ভয় দেখাবার জন্য বন্দুকের কুচকাওয়াজ করে সে প্রস্থান করল। জেলখানা আরও গরম হয়ে উঠল।

ওরা চলে যাবার পর মনে হল, যেন মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি। সামান্য কারণে আজ আমরা প্রাণ হারাতে বসেছিলাম—শত্রুকে সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সী জেলের ইটের লাল মাটির ওপর আমাদের নিঃসার দেহ পড়ে থাকত, আর ওরা লিখত, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীরা সিপাহীকে মেরে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, কেবল ত্বরিত হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থ হয়েছে এবং দুইজন মাত্র সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে। রাজকীয় ঘোষণার সময় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

হয়তো এর জন্য কোনও সম্মানজনক পদবীও পেতে পারত। বিদ্রোহী মন ভাবে, বেঁচেই যখন গিয়েছ একবার ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখাও না—কেমন করে সে আস্ত আস্ত কথাগুলি বলে সেরে যায়! কোর্ট তো এখনও শেষ হয় নি, শেষ হবার কিনারায় শুধু এসেছে।

ইংরেজের শাসন পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বত্রই সবলতার ছাপ রয়েছে। পরের দিন কোর্টে উপস্থিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিচারকদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে প্রতিকারের দাবী জানালাম। তাঁদের জানালাম, প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের দু'জনেরই জীবন-সংশয়াপন্ন। জেল থেকে পালিয়েছিলাম বলে জেল-কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা বিরাগভাজন হয়েছি, তাই ওরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুতা পেলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে ও খুন করবার ভয় দেখায়। কাটারিয়ার অমূল্য কথাগুলি জুড়ে দিয়ে প্রার্থনা করলাম যেন বিচারের সময়টা আমাদের জেল থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখা হয় যেমন রেখেছিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের লাহোর-দুর্গে।

বিচারক কে. সি. দাশগুপ্তের নিরপেক্ষতার সুনাম ছিল। পুলিসের কথা বা কারসাজিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মনোযোগ দিয়ে তিনি সব শুনলেন এবং সভাপতিও সহকারী বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ করে জরুরী নির্দেশ জেলে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাদের আশ্বাস দিলেন যে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য বিচারকরা চেষ্টা করবেন।

কোর্টের নির্দেশ পেয়ে কাটারিয়ার টনক নড়ে গেল। কেমনতর কয়েদী এরা! একেবারে কোর্টের পরওয়ানা এনে হাজির করেছে! কাটারিয়ার সুর বদলে গেল এবং আমাদের অভাব অভিযোগ জানতে চাইল। কাটারিয়া বিলেত ফেরত ডাক্তার। ডাক্তারী আইনগুলি নিশ্চয়ই তার পড়া ছিল, কিন্তু পড়া ছিল না—শাসন-ইতিহাসের পাতাগুলো যেখানে ওয়ারেন হেস্টিংসকেও কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের নিকট নাজেহাল হ'তে হয়েছিল।

তেইশ

টিটাগড় মামলার শেষ অধ্যায় ঘনিয়ে এল।

রাজসাক্ষী সন্তোষ সেন সনাক্ত করবার সময় ডকের সামনে এসে কেঁদেই ফেলল কিন্তু সনাক্ত করতে সে একটুও ভুল বা দ্বিধা করল না। তার পার্টি-প্রধান ও শ্রদ্ধেয় দাদা প্রফুল্ল সেন থেকে শুরু করে, অন্তরঙ্গ বা পরিচিত কাউকেই সে বাদ দিল না—ধীরেন্দ্র মুখার্জি, কালীপদ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র বসু, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, জগদীশ চক্রবর্তী, পারুল মুখার্জি, লেখক এবং আরও অনেককেই সে দেখিয়ে গেল।

বৈপ্লবিক সংগঠনে রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি বৈপ্লবিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দল ও পার্টি-সভ্যদের নিশ্চিহ্ন ও হনন্, যত সম্পূর্ণভাবে সে করবে, ততই তার নিজের নিরাপত্তা বাড়বে এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথও সুগম এবং সহজ হবে।

আলিপুর বোমার মামলা, ১৯০৮ সাল। বাংলা—বাংলা কেন সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক প্রেরণার বাহ্যিক অগ্নিস্ফুরণ। শ্রীঅরবিন্দ—বারীন—উল্লাসকর—উপেন্দ্রনাথ—হেমচন্দ্র—বিভূতি—কানাই—সত্যেন—সবাই আসামী। শ্রীরামপুরের জমিদার তনয় বা বংশোদ্ভব আসামী নরেন গোসাঁই রাজসাক্ষী। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু, সত্যেন দত্তের বোনের সাহায্যে খাবারের ভেতর বাইরে থেকে রিভালভার নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেলে নরেন গোসাঁইকে গুলি করে হত্যা করলেন—তাঁরা দলকে বাঁচালেন, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু জাতির নমস্য হয়ে রইলেন—বৈপ্লবিক দৃঢ়তার গ্রেনাইট-কঠিন প্রস্তরে বাঁধা রইল তাঁদের ছবি—জাতির অন্তরে।

যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক বিশ্বাস-দ্রোহীদের কখনও ভোলে না। আলিপুর জেল থেকে পালাবার পর পুরানো পার্টি বন্ধু ঢাকার হরিশচন্দ্র সরকার মিত্র উপাধিধারী একটি বিশ্বাসঘাতকের কথা লোক পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। হরিশ তখন বিলেত থেকে এসে নামী কোন ব্যাঙ্কের

ম্যানেজার কিন্তু তার অতীত দিনে যখন সে বিপ্লবকে সার্থক করে তোলবার জন্য কাজ করত, সে সময় দলের উক্ত সভ্য পার্টির বিশেষ গোপন খবরগুলি—রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের গোপনে ভারতে আগমন এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পার্টির আশ্রয়ে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থাদির সংবাদ ঢাকার পুলিসকে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে বিলেত চলে গেল, নিজের ভবিষ্যৎ বানাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কোনও এক বড় কোম্পানীর বড় চাকুরিতে বা ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান করল, তা তখনও হরিশের মন থেকে মুছে যায় নাই।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এই মামলা জড়িত—একই দলের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মাত্র—আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মানস-সন্তান। তাই সরকার পক্ষকে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার অনেক সাক্ষ্য ও প্রমাণ আবার এই মামলায় এনে হাজির করতে হল।

টিটাগড়-ষড়যন্ত্রের ব্যাপ্তি কাল মাত্র চার মাস—১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত। এই অল্পকালের মধ্যে ষড়যন্ত্র গভীর ও ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে না। তাই পুলিসের ভরসা ছিল,—প্রধান রাজসাক্ষী সন্তোষ সেন ও অপর রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্য, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্র, খান কয়েক চিঠি ও সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত একটি তালিকা এবং সাক্ষীদের দিয়ে সনাক্তকরণ। এই মামলাকে সাজিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ না দিতে পারলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অ-প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে কারণ বিশেষ আদালতের বিচারে ন্যায়ের মর্যাদা রাখবার লোক তখনও দু'এক জন মাঝে মাঝে দেখা যেত। যদি কোন বিচারক গভীরভাবে সত্যানুসন্ধানী হয়ে পড়েন, তার জন্য পুলিস চেষ্টা করছে যেন সাক্ষীসাবুদের মধ্যে কোনও দুর্বলতা না থাকে। অভিজ্ঞ পুলিস অফিসার মন্মথ সেন সরকার পক্ষের দুর্বলতার পাহারাদার, আর আইনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে জল্লাদের কর্তব্যে পাবলিক

প্রসিকিউটারের দল। সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্র প্রমাণের জন্য বিশেষ করে জোর দিল টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিসগুলোর ওপর—বোমার মাল-মসলা বা বোমার প্যাটার্ন, সাময়িক কিতাবাদি এবং বিশেষ করে কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রটি। এই সব মূল উপাদানের মধ্যে আবার রিভালভারটিই ছিল ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। ঐটিকে যদি ঠিকমতো কারুর ওপর চাপিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে তাতে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মুখার্জি, নাগ ও সেন মহাশয় খুবই চেষ্টা করলেন যাতে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আমার ওপরই চাপান যায় কিন্তু ট্রাইব্যুনালের সদস্য কে. সি. দাশগুপ্ত মহাশয় সঠিক প্রমাণ চাইলেন। শ্যামবিনোদ ও পারুল যে দাবীদার ছিল না, তার প্রমাণ কোথায়? যা'হোক পুলিস খুব সুবিধা করে উঠতে পারছে না বলেই মনে হল। বিশেষ করে নিক্ষিপ্ত রিভালভারটি অনেক দূর থেকে কুড়িয়ে পাওয়ায় ট্রাইব্যুনালের ধারণা হয়েছিল, হয়তো শ্যামবিনোদের বলিষ্ঠ হাতেই উহা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। তবুও পুলিস আশা ছাড়ল না।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মেদিনীপুরের কংগ্রেস-নেতা এড্‌ভোকেট মন্মথ দাস (গভর্নমেণ্টের কোপানলে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কৃত) মহাশয় গ্রেফতার কালীন পুলিস খানাতল্লাশীর তালিকা তাঁর সবল জেরার মুখে অনেক খানি ঘায়েল করে দিয়েছিলেন।

সওয়াল আরম্ভ হল। প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধেই একে একে অভিযোগের গুরুত্ব দেখিয়ে বলল যে এই বিপজ্জনক দলটির অভিযুক্তদের কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত কিন্তু দলের প্রধান নায়ক, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে আইন ব্যবস্থিত চরম দণ্ড দিলে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয়। একটি মামলায় যখন সে একজন প্রধান আসামী তখন পালিয়ে গিয়ে দলের সভ্যদের নিয়ে আবার এক ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হল—ভারতে বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ কল্পে এবং এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি ছুঁড়বার সময় তারই হাতে ছিল। অতএব চরম দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র

উপযুক্ত দণ্ড—তাতে ন্যায় ও আইনের মর্যাদা রক্ষে হবে। আমরা সবাই সরকারের সওয়াল মনোযোগ দিয়ে শুনছি—কিন্তু ওদের আকুল আবেদনে বিচারকরা যেন সায় দিচ্ছেন না, বিশেষ করে বিচারক সদস্য কে. সি. দাশগুপ্তকে যেন এতটা বোঝাতে পারছে না (যদিও বিপ্লবী সভ্যদের অপসারণের জন্যই অস্ত্র-আইন নতুন করে ঢেলে সাজা হয়েছিল)। সরকারী পক্ষের কথা শেষ হলে, আমাদের কৌঁসিলী ষড়যন্ত্রে আমাদের নির্দোষিতার প্রমাণের কথা বললেন—আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা তুললেন, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিসগুলি পুলিস কর্তৃক চাপিয়ে দেবার কথা উঠালেন, অস্ত্রটির সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবের কথা বললেন, হাতের লেখা বা সাঙ্কেতিক লেখাগুলি প্রমাণিত হয় নি বললেন এবং রাজসাক্ষীদের কথাগুলি পুলিসের বানানো বলে ব্যাখ্যা করলেন।

বিপ্লব আন্দোলনে মথিত দিনগুলিতে বিশেষ আদালতের বা ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে দণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। ইহার ব্যতিক্রম বড় দেখা যায় নাই। ইংরেজ বণিকসভার রাজশক্তির উপর প্রভাব ছিল প্রচণ্ডতম। পুলিস ও পাবলিক প্রসিকিউটার আইনের চেয়েও অধিক তা গ্রাহ্য করতেন, এবং তদনুযায়ী সাক্ষ্য সংগ্রহ, প্রস্তুত ও আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন।

এমতাবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞ কৌঁসিলী ব্যারিস্টার জে. সি. গুপ্ত সহ সকলেই ওদের মনোভাব দেখে আতঙ্কিত ছিলেন যে ট্রাইব্যুনালের ওপর তারা অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে এবং আমার ওপর চরম দণ্ড দিতে প্ররোচিত করতে সক্ষম হবে। রায় দেবার পূর্বে বিচারকদের সাথে তাদের দণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা তার পূর্বাভাষ বলে জানতেন। তাই ব্যারিস্টার ও কৌঁসিলীরা আমার অজ্ঞাতসারে নিকটতম বিপ্লবী বন্ধুদের আভাস দিয়ে সতর্ক করেছিলেন যেন আমার সঙ্গে তাদের সবকিছু কথাবার্তা রায়ের পূর্বমুহূর্তের মধ্যেই

শেষ করিয়ে রাখেন কারণ রায় দানের অব্যবহিত পরই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীকে অন্যান্যদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।

রায় দেবার দিন। আমরা সবাই উপস্থিত। বিচারকদের রায় পড়া শুরু হল। ফাঁসির দণ্ড নেবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছি। অনন্ত পথের যাত্রা—হয় ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে, নয় তো পীড়নের রথচক্রে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়ে। দেশকে স্বাধীন করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর থেকে যখন বের হয়েছিলাম, দুঃখী-মায়ের অবুঝ কান্নার আবেগ যেন ঘরের জানালা বেয়ে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করত। সেই সুরের রেশ তখনও যে কানে না বাজত বা মনে না হত তা নয়; কিন্তু তবুও কেমন করে তা' যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। একমাত্র মায়ের মঙ্গল মূর্তিখানিই মনের উপর ভেসে উঠত—মনে হত, যেন জন্ম জন্মান্তরের আশীর্বাদ নিয়ে মা শিয়রে বসে আছেন। শুধুমাত্র এ-জীবনের আশীর্বাদ নয়—জীবন হতে জীবনান্তরে মঙ্গলকে পূর্ণ করবার আশীর্বাদ। সেই মঙ্গল কাজে হয়তো আমার ডাক এসেছে।

বিচারকরা যাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন তাদের নাম, দণ্ডের পরিমাণ ও দণ্ডের ধারা বলে যেতে লাগলেন। আমার নাম বলে আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন—সকল ধারাতেই আমার দোষ অখণ্ডনীয় কিন্তু দণ্ডের বেলায় আমাকে যাবজ্জীবন দণ্ড ঘোষণা করতেই বন্ধুরা সবাই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। আমাদের কৌঁসিলীরাও খুশি কারণ তাঁরা জানতেন যে ফাঁসির দণ্ড একবার দিলে তাকে আপিলে খণ্ডন করা কঠিন হবে।

তারপর একে একে দণ্ডের তালিকায় এল—

২। প্রফুল্ল সেন—চৌদ্দ বৎসর। ৩। শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী—দশ বৎসর। ৪। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত—সাত বৎসর। ৫। নিরঞ্জন ঘোষাল—সাত বৎসর। ৬। ধীরেন্দ্র মুখার্জি—পাঁচ বৎসর। ৭। হরেন্দ্রনাথ মুন্সী—পাঁচ বৎসর। ৮। কার্তিক সেনাপতি—

পাঁচ বৎসব। ৯। জগদীশ চক্রবর্তী—পাঁচ বৎসর। ১০। শান্তি সেন—পাঁচ বৎসর। ১১। জীবন ধুপী—চার বৎসব। ১২। বিভূতি ভট্টাচার্য্য—চাব বৎসর। ১৩। দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি—চার বৎসর। ১৪। জগদীশ ঘটক—চার বৎসব। ১৫। সুধাংশু বিমল দত্ত—তিন বৎসব,। ১৭। পারুল মুখার্জি—তিন বৎসর।

প্রমাণ অভাবে যাবা মুক্তি পেল—

১। ধনেশ ভট্টাচার্য ২। সীতানাথ দে ৩। মাখনলাল কর ৪। রবীন্দ্র ঘোষ ৫। কালীপদ ভট্টাচার্য ৬। অজিত মজুমদাব ৭। জীবন দে (ওরফে নীবোদ ব্যানার্জি) ৮। জুড়ান গাঙ্গুলী ৯। বীরেন বসু ১০। ধীরেন ধব ১১। যজ্ঞেশ্বব দে ১২। দেবব্রত বায়।

ট্রাইব্যুনালের বায হযে গেল। বিশেষ আইনে গঠিত ট্রাইব্যুনালেব বিচারে একমাত্র পুলিস ও বিচারকদেব মর্জির ওপরই ভাগ্য নির্ভর করত। পুলিসের তখন একছত্র-বাজত্ব—তাবা মনের মতো করে সাক্ষী বানিযে সাঁজি ভরে সরকারী উকীলদেব হাতে তুলে দিত, এমন কি দণ্ডেবও পবিমাণ ঠিক করে দিত। কিন্তু টিটাগড় মামলায় এদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। ট্রাইব্যুনালেব প্রেসিডেন্ট মি. বিভাব ও সদস্য কে. সি দাশগুপ্ত পুলিসেব সাক্ষ্য বা নির্দেশের উপব নির্ভর করেন নি। আসামীদের পক্ষও তাঁবা দেখতে চেষ্টা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ তাঁরা আমাদের দিয়েছেন। দণ্ড ব্যবস্থায ঝানুদের ফাঁসি কাষ্ঠে না ঝুলিয়ে স্থায়ীভাবে জেলে রাখাবার ব্যবস্থা করে তাদের অভ্যস্থ জীবন যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন, আর নতুনদের অনেককেই হালকা সাজা দিয়ে বা বোবস্টাল জেলের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে ভাববার সময় দিয়েছেন। মেয়ে-আসামী পারুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্যামবিনোদের চেয়ে কম ছিল না, তবুও সেখানে তাঁরা উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের মুক্তি দিয়েছেন, তাব মধ্যে ধনেশ ভট্টাচার্য ও সীতানাথ দেকে দণ্ড দিতে হলে ছুতার অভাব হ'ত না। ঐ সময় নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড দেবার দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

চট্টগ্রাম বংশযা ডাকাতিতে পার্টির পুরাতন সভ্য ৺যশোদা চক্রবর্তীর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পার্টি-সভ্য মোক্ষদা ও প্রিয়দা এবং পার্টি-সভ্য মহেশ বড়ুয়ার সাথে সম্পূর্ণ নিরীহ ও নির্দোষ তাদের দু'জন গৃহকর্মচারীকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিস সাক্ষী বানিয়ে মোক্ষদা, প্রিয়দা ও মহেশ বড়ুয়ার মতোই তাদেরও যাবজ্জীবন নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছিল। একবারও তারা ভেবে দেখেনি, এদের পক্ষে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব ছিল কি না।

রায় হয়ে যাবার পর হাইকোর্টে আমাদের আপিল দায়ের হল। সেখানকার শুনানী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সবারই আন্দামান-যাত্রা স্থগিত রইল।

চব্বিশ

ভারতের সমুদ্রোপকূল থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রায় আট শত মাইল দূরে—সমুদ্রের মাঝখানটায় যেন প্রহরীর মতো জেগে রয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া থেকেই আন্দামান দ্বীপ নির্বাসনের দ্বীপ হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারা ভারত থেকে যেমন দুর্দান্ত স্বভাবের কয়েদীদের এনে সেখানে রাখত তেমনি রাজনৈতিক কারণে যারা বিপজ্জনক বলে গণ্য হ'ত তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করত। ওয়াহাবী আন্দোলনের অনেকেই সেখানে জীবন কাটিয়েছেন—ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো, ১৮৭১ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতার হস্তে আন্দামানে নিহত হন। বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের নব-জাগরণ সূচিত হল, মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। তাকে স্তব্ধ করবার জন্য আন্দামানের বন্দীশালা ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবীগণের আবাসভূমি হয়ে উঠল। বারীন ঘোষ, পুলিন দাস থেকে শুরু করে বাংলার ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের পদচারণে আন্দামান হয়ে উঠল, ভারতের জাতীয়

আন্দোলনের পুণ্যতীর্থ—স্বাধীনতার উচ্চশিখরে পৌঁছবার দুর্গম রাস্তা। ১৯৩০ সালের পর বৈপ্লবিক আন্দোলন আবার যখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন দলে দলে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান যাত্রা শুরু হয়ে গেল। মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ও কলকাতা থেকে একখানা করে জাহাজ বন্দী ও খোরাক নিয়ে মাসে একবার যাতায়াত করত। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা মানুষের সভ্যতার পরিচয় পেয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আন্দামানের কথা, সভ্য সমাজের নির্বাসিতদের জীবন-কথা।

বাংলার জেলের মতো আকাশচুম্বী দেয়াল দিয়ে আন্দামানের সেলুলার (cellular) জেলকে ঘিরে দেওয়া হয় নি, সেখান থেকে সাঁতার কেটে বা দেয়াল ডিঙিয়ে পালাবার কোনও পথ ছিল না বলে। বাংলার জেলের নিকৃষ্টতম খাবার ব্যবস্থার মতো সেখানকারও ব্যবস্থা, বরঞ্চ আরও এক ধাপ নীচে। আবহাওয়া বাংলার চেয়েও খারাপ। দৈনন্দিন কাজকর্ম বাংলার জেলের তুলনায় বেশী ছিল না। আন্দামানের শাসন ব্যবস্থা ছিল, ইংরেজ রাজত্বের প্রাথমিক যুগের চিহ্ন-স্বরূপ চীফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ। আইন কানুনের বালাই নাই—চীফ্-কমিশনারই শেষ পর্যন্ত দণ্ড মুণ্ডের কর্তা (সেখানকার অপরাধে ফাঁসি পর্যন্ত দেবার তার একতিয়ারের মধ্যে ছিল)। তবুও বিপ্লবী বন্দীরা বাংলা ছেড়ে আন্দামানে পালাতে চাচ্ছে। বাংলার জেলে তাদের জীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি পাহারাদার, প্রতিটি অফিসার, পুলিসের নির্দেশ মতো অত্যাচারের নগ্ন কুড়াল হাতে বিপ্লবী বন্দীদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুর দৃষ্টিপাতে। তাদের অত্যাচারে মথিত ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা শরীর ও মনের তন্তুগুলো যেন বিশ্রাম নিতে চায় কোথাও কোন নিভৃত আড়ালে, গভীর বনের অন্ধকারে বা শ্বাপদ সঙ্কুল রাজ্যে—ক্ষণিকের বিশ্রামও উপভোগ্য। একেই আমরা 'আন্দামানের মন' বলতাম। ১৯৩০ সালের পর প্রথমকার যাত্রীদের মধ্যে ছিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ও মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামীরা। বাংলা

যত তেঁতে উঠল, আন্দামান বন্দী নিবাস ততই ভরে উঠতে লাগল। বাংলার আগুন ভারতের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল—সেখানকার অগ্নি-পূজারীর দলকে দল আন্দামানে নির্বাসিত হ'য়ে এল। স্বাধীনতার দুর্গম পথ সার্থকতায় ভরে উঠল। ভারতের দৃষ্টি রইল, আন্দামানের দণ্ডিত শৃঙ্খলিত সন্তানদের দিকে। চার' পাঁচশো দণ্ডিত বিপ্লবীর সমাবেশে নরক গুলজার হয়ে উঠল—আন্দামান যেন আর আন্দামান রইল না।

বাংলা জেলের অত্যাচার শুরু হল ১৯৩২ সালের পর থেকে। তাই প্রথমকার যাত্রী দলের মধ্যে আন্দামানে যাবার মন ছিল না। অত্যাচারের আকার প্রকার সম্বন্ধে দেহ ও মনে অনভ্যস্ত চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার অনেকেই ছিলেন আন্দামানে। কর্তৃপক্ষের সহিত সংগ্রামমূলক ব্যবহারে কদম কদম পা ফেলে তাঁরা প্রথমে একত্রে চলতে পারেন নি। "জালিয়ান-ওয়ালা-বাগের" অত্যাচার যেমন ভারতকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জেলের অত্যাচার বিপ্লবী-বন্দীদের দল নির্বিশেষে একত্রে বেঁধে দিয়েছিল—যার মূল্য ছিল মনোরাজ্যে।

এক টানা জেল খাটা শুরু হল। হাইকোর্টে বিচারের জন্য কোর্ট-কাছারীতে আমাদের আর যেতে হবে না। উভয় পক্ষের কৌঁসিলী ও বিচারকরাই তার সমাধান করবেন। কিন্তু তবুও আবার এক বিচারের প্রহসনে দাঁড়াতে হল। সিপাহীকে মারবার অভিযোগে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, অনারেবল সুশীল সিংহ বিচার করবার জন্য জেল গেটে এসে হাজির হলেন। আসামীদের মধ্যে আমরা দুইজন, নিরঞ্জন ও লেখক। ভাবলাম—এ আবার কি ধরনের বিচার, এর আবার সাজাই বা কি হবে? শুনেছিলাম, আমাদের বেত মেরে প্রতিশোধ নেবার জন্য কাটারিয়া লিখেছিল, কিন্তু পুলিস-কমিশনার নাকি এত সহজ রাস্তায় প্রতিশোধ নিতে রাজী হয় নি। কমিশনার ঝুনো-লোক। কলকাতা শহরের ওপর রাজনৈতিক বন্দীদের

অত্যাচারের ফলে জেলের ইনসপেক্টর-জেনারেল সিমসন্ সাহেব গভর্নমেন্টের খাস্ দপ্তরে বিপ্লবীদের (বিনয়-বাদল-দীনেশের) আক্রমণে প্রাণ হারাল—সে তো মাত্র সেদিনকার কথা। 'শোধ-বোধ' বলে একটা কথা আছে। কাটারিয়া সাহেবের উৎসাহী প্রস্তাব নাকচ হল। তাই এই বিচার বা বিচারের প্রহসন, আইনের মর্যদা রাখবার জন্য। আমরা পোশাক পরিচ্ছদ পরে (অর্থাৎ কুর্তা-জাঙ্গিয়া-গামছা এবং ডাণ্ডা-বেড়ি ও লালটুপির সম্মিলিত পোশাকের ঐশ্বর্য) সিপাহী-সান্ত্রীদের সঙ্গে জেল গেটের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কতকটা সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে গেলাম। বাইরে থেকে জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম, বিচারক একটি কাঠের চেয়ারে তাঁর মসনদে আসীন। আর তাঁর পাশে রয়েছে প্রতাপান্বিত কাটারিয়া সাহেব, জেলের অফিসার বৃন্দ, পুলিসের লোক আর সরকারী প্রসিকিউটার। বাইরে আমাদের প্রতি হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রসিকিউটার ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদেব দিকে চেয়ে পুলিসের বর্ণনা শুনছেন—তাঁর মনে কিসের যেন খট্‌কা লেগেছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডিফেণ্ড' করবার উকীল কোথায়? নিষ্প্রয়োজন বলে আমরা উত্তর দিলাম। সরকার পক্ষকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের দণ্ডের পরিমাণ জানতে চাইলেন। কাটারিয়া সাহেব আমাকে দেখিয়া উৎসাহ ভরে বলে উঠল, শীর্ণদেহ লোকটির মোট সাজা হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর আর তার পাশের আসামীটির হয়েছে, চৌদ্দ বৎসর। ম্যাজিস্ট্রেট মুখে কলম গুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে একটি কথা মাত্র উচ্চারণ করলেন, **useless** অর্থাৎ দণ্ড দেবার কোনও অর্থই হয় না। তবুও আমাদের দুই বৎসর করে দণ্ড দিলেন। আগের দণ্ডগুলি খাটবার পর এ দণ্ড চলবে অর্থাৎ মোট সাত চল্লিশ বৎসর দণ্ড খাটতে হবে, যদি আবার কিছু পরে যোগ না হয়।

অত্যাচারের যে দিনগুলি চলে যেত, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। নিঃসঙ্গ সেলবাস, কাজের খাটুনি এবং চারদিকে কড়াকড়ির ব্যবস্থার

মধ্যে একটা নিঝুম পৃথিবী আপনা হতেই নেমে আসত—বর্তমান পৃথিবীর আলো-বাতাস, জীব-জন্তু, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত, একমাত্র থাকত কয়েদ-জীবন আর তার নিষ্ঠুরতার পরিবেশ। এই গহন তমিস্রার ভেতর নিজের মনের মধ্য থেকে পথের সন্ধান করে বেড়াতাম আর গুণগুণ করে কবির কথা উচ্চারণ করতাম, "জীবনের যত পূজা হয় নি কো সারা"। মনের এই নিঃসীম শূণ্যতার মাঝে পথ টেনে টেনে চলতে অনেকে হয়ে যেত পথ ও দিশেহারা—মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণের প্রাথমিক উপাদান। ফরিদ-পুরের বন্ধুবর সুরেন কর, ঢাকার তরুণ বিপ্লবী ভূপেশ ব্যানার্জি, বরিশালের যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী ফণী দাশগুপ্ত ও ঢাকার বিমল ঘোষ সহজ রসিকতা হারিয়ে ফেলল—জীবনের গুরুভার টানবার যে সেভার তা বিকল হয়ে গেছে।

জেলখানায় বন্দীদের বই দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল তা আমাদের বেলায় নিষিদ্ধ ছিল। বই-পত্র দিতে গেলে হাত বদল হবে। বদল-করা বইখানা আবার অন্যের হাতে পড়বে—সারা জেলে ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা ছিল। বিশেষ করে বইখানাকে সাঙ্কেতিকে পরিণত করলে সরকার পক্ষের লোকেরা শুধু তার বাহক হবে অর্থাৎ সরকার বিরুদ্ধ কর্মে তারা না জেনে সাহায্য করবে—তার জন্য কোনও বই-ই আমাকে দেওয়া বারণ ছিল; এমন কি কোনও থালা বাটি পর্যন্ত আমার কাছ থেকে অন্যত্র পাঠান নিষিদ্ধ ছিল। এই নির্দেশের পেছনে একটি গুপ্ত রহস্য ছিল—তারা যে খামখা করেনি তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম। জেলে আসবার পর খাবারের থালা ও বাটি খাবারের শেষে আবার রন্ধন-শালায় চলে যেত। থালা ও বাটির তলায় একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন এঁকে দিতাম যাতে সচেতন পার্টি সভ্যদের হাতে পরলেই থালাখানা উলটিয়ে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি দেখতে পেলে বুঝতে পারবে যে এটা আমার ইংগিত। সে তখন থালার পেছনে অন্য চিহ্ন দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করবে। এই ব্যবস্থার পর আমার প্রয়োজন জানাব। এইভাবে কিছুদিন দেবার

পরও জেলে আবদ্ধ সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই তারা আমার জন্য থালা ও বাটি নির্দিষ্ট করে দিল এবং বইপত্র দেবার ব্যাপারেও সাবধান হল। পুস্তকাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের মনের ভেতরই সঞ্চরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে রেখে কথা বলতাম—দেওয়ালই হয়ে উঠত সঙ্গী। দেওয়ালের গায়ে চীনা নাবিকদের ছোট ছোট লাল-ইটের কুঁচি দিয়ে জাহাজের ছবি, নীলনয়না কোনও রমণীর ছবি আঁকা। সাময়িক ভেবে মন দেখত সমুদ্র, তার উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে বিদেশী বণিকের পণ্যভরা জাহাজগুলো—ওপারে বণিকের ঐশ্বর্য ও বৈভবের লীলাভূমি আর এপারে নিঃস্ব ভারতভূমি।

মনের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ত, বুটের খট্ খট্ শব্দে—পাহারাওয়ালাদের পায়ের তালে আর বাইর থেকে নিক্ষিপ্ত আলো নিয়ে আসামীকে দেখে নেবার চেষ্টা, যেন শিক কেটে বা মন্ত্র বলে সে ভেগে না যেতে পারে। তালাগুলি মাঝে মাঝে খট্‌খটিয়ে উঠত, আর শিকগুলি ঝন ঝন করে বাজত—কি জানি, কেউ যদি বাইরে থেকে তালাগুলি খুলেই দিয়ে থাকে বা শিকগুলি কেটে দিয়ে থাকে !!

মনের খোরাক টেনে নিতাম অতীত স্মৃতির গহন গভীর থেকে, জ'বনকে পেরিয়ে শত সহস্র বৎসর ইতিহাসের পিছন পাতায় যেখানে সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে ভবিষ্যতের অনিবার্য ইংগিত বহন করে আছে।

গ্রীষ্মের গরম যেন দাবানল জ্বেলে রাখত ডিগ্রির ভেতর। গবাদের শিকের ভেতর দিয়ে নাক গলিয়ে বাইরে থেকে হাওয়া টানবার চেষ্টা করতাম। নাকটা যদি আরও একটু বড় হ'ত—আমার মামাদের মতো হ'ত! তবে আরও বেশী করে হাওয়া টেনে নিতে পারতাম।

কিন্তু আলো তো টানতে পারছি না, সে তো দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

ছোট বয়সে মানুষ হয়েছি অনন্ত আকাশের তলে, সীমাহীন মাঠের পারে, আলো-বাতাসের ঐশ্বর্যপূর্ণ সমারোহ ও আড়ম্বরের মধ্যে। ছুটে যেতাম সূর্য ধরবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় মাঠের ওপারে খালের ধারে আর সেখান থেকে গায়ের দিদিমা সকালে "সূয্যি" শিয়রেই পৌঁছে দেবার ভরসা দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন, মায়ের কোলে। তখন তো সত্যি সত্যিই তিনি সূর্য পাঠিয়েছিলেন! আর এখন তো দেখছি সূর্য বন্দী হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্য-দানবের কাছে।

পঁচিশ

কঠিন পরিবেশের এই শূন্যতার মধ্যে রূঢ় তালে এসে দেখা দিত, মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফাঁসির আসামীরা, নিকট প্রতিবেশী হ'য়ে।

কেউ বা সুরাপানে মত্ত হয়ে, কেউ বা লালসার উন্মাদনায়, কেউ বা অন্যের দৌলতকে আত্মসাৎ করবার প্রবল আগ্রহে, কেউ বা মর্যাদা রক্ষার অধীরতায়, কেউ বা নির্জ্ঞান মনের বিচারহীন ইংগিতে খুনের দায়ে প্রাণ হারাবার আদেশ পেয়ে হাজির হ'ত।

প্রতিবেশী হ'য়ে এল মামা-ভাগ্নে দু'জন। চাষীর ছেলে তাড়ি খেয়ে নেশার মেজাজে খুন করেছিল কাউকে, তাই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। মামার চেয়ে ভাগ্নে বলিষ্ঠ—তাজা ও নবীন যুবক—স্বাস্থ্য যেন উপচিয়ে পড়ছে—প্রাণের তেজ ফুটে বেরোচ্ছে। ফাঁসি যে তাদের হ'তে যাচ্ছে, এ ধারণা তখনও তাদের হয়নি। কথা-বার্তা চাল-চলনে অতি সহজভাব পরিস্ফুট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনও লক্ষণ যেন নেই। লাটের নিকট প্রাণ-ভিক্ষার মামুলি জবাব না আসা পর্যন্ত তাদের ফাঁসি স্থগিত রয়েছে মাত্র।

কানে ভেসে আসছে, ডিগ্রিগুলির পিছনে অবস্থিত ফাঁসিমঞ্চের মহড়া—"লেভার" (**Lever**) টানার শব্দ। আসামীদের সমান ওজনের দুইটি বালিপূর্ণ বস্তাকে মঞ্চের ওপরকার ফাঁসির দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে

দিয়ে লেভার টেনে দড়ির ও মঞ্চের একসাথেই পরীক্ষা চলছে। লেভার টানার সাথে ফাঁসির মঞ্চ (কাঠের তৈরী প্ল্যাটফরম্) সরে গিয়ে দড়ির মতোই ফাঁসির গহ্বরে ঝুলতে থাকবে। মহড়া শেষ হলে অতি প্রত্যুষে এক নির্দিষ্ট তারিখে বস্তা দুটির জায়গায় এসে দাঁড়াবে, মামা-ভাগ্নে দু'জন—একই মঞ্চে—একই সময়ে। লেভার টানার সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরে পড়ে তাদের গলার হাড়খানা ভেঙ্গে গিয়ে প্রাণহীন দেহ ঝুলতে থাকবে দড়ির ওপর পাশাপাশি। জীবনবায়ু বের হয়ে যাবে দূরে-বহুদূরে। যাতে আর জীবনের স্পন্দন না থাকতে পারে তার জন্য রয়েছে ডাক্তারী-অস্ত্র—দড়ি থেকে নামিয়ে গহ্বর থেকে টেনে এনে শিরা-উপশিরাগুলি কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা। তারপর শ্মশানে, কবরে চিলে বা বায়ুমণ্ডলে ধর্মানুযায়ী তার শেষ পরিণতি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুশাসন রয়েছে—প্রত্যেক প্রজার ধর্মাচরণ অলঙ্ঘনীয়। ফাঁসি যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যবস্থার ত্রুটি নেই—গঙ্গাজল, গঙ্গা মাটি, ফুল, স্নানাদি ও নূতন বস্ত্র পরিধান—জিলার ও জেলের মালিক শোভাযাত্রা করে জেল ও সাধারণ পুলিসের বাহিনী নিয়ে আগমন। যে জল্লাদরা মাথা ও মুখ ঢেকে দিয়ে এবং গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে লেভার টানবে তারা পাবে একটি করে ভিক্টোরিয়ার গিনি ও তরল পানীয়। যারা ফাঁসিমঞ্চের গহ্বর থেকে দেহ টেনে আনবে, তারাও বঞ্চিত হবে না পুণ্য কাজের পাওনা থেকে।

ওদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর হল। বিকেল বেলা মাথার টুপি বানাবার জন্য লোক এল। তারা এতেও বুঝতে পারল না যে রাত্রির শেষেই তাদের ফাঁসি হয়ে যাবে। রাত তিনটের সময় সার্জেণ্টরা এল—জেগেই ছিলাম। সার্জেণ্ট তৈয়ার হ'তে বলল—এবার তারা বুঝতে পেরেছে। বুকফাটা কান্না শুরু হল, কত অনুরোধ, কত উপরোধ, কত আক্ষেপ, কত বিলাপ যেন অসহায় দুটি মানব শিশু বন্য জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সমগ্র মানব ও প্রকৃতির কাছে তাদের সকরুণ আবেদন জানাচ্ছে।

আর সময় নেই—ফাঁসির নির্ধারিত সময় আগত। সিপাহীর দল ওদের হাত দুখানায় পেছন দিক থেকে শিকল পরিয়ে ও দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চে। যাবার পথটুকু কান্নার রোলে ভরে গেল। তারপর কানে এল, লেভার টানার শব্দ—"খট"। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কাঠ দু'খানা দু'দিকে সরে গেল—দড়ির সঙ্গে বাঁধা ওদের দেহ পড়ল গহ্বরে। কান্নার রোল বন্ধ হয়ে গেছে, চারদিক নিথর-নিস্তব্ধ। সিপাহীরা নিঃশব্দে ফিরে এল। চেয়ে দেখি, বুড়ো সার্জেণ্ট "হাওড়া ব্রিজ"—হাওড়া ব্রিজের মতো তার দেহ ছিল উঁচু ও সেখানে পুলিস সার্জেণ্ট হিসাবে এক সময় পাহারা দিত বলে এই নামেই সে জেলে পরিচিত ছিল এবং দুই তিনটি হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আমার ডিগ্রির সামনে বসে কাঁদছে—আমার চোখেও জল এসেছে।

সারাটা দিন যেন সমস্ত জেলটার উপর বিষাদের এক গুমোট আবহাওয়া বিরাট ডানা মেলে বসে রইল। বেদনা বিধুর এই দিনগুলি মনের নিঃসার নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিত।

আবার গতানুগতিক চলল দিনগুলো। স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। জেলের নিম্নতম তৃতীয় শ্রেণীর খাবারের ব্যবস্থা (বোধ করি পুলিস অফিসার মন্মথ সেনের কৌশলেই এ ব্যবস্থা হয়েছিল) ভাত, ডাল ও তেঁতুল. তাও যেন খেতে পারছিনা। দেহ যদি চলতে না চায়, তবে ওরা কি মামা-ভাগ্নের মতো হাত পা বেঁধে সামনে টানবে নাকি? জেলের হাসপাতালে চিকিৎসার যে সামান্যতম ব্যবস্থা ছিল, তাতো এণ্ডারসন লাট-সাহেবের কৃপায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—মর আর বাঁচ চিকিৎসার যা' কিছু ব্যবস্থা একমাত্র ডিগ্রির মধ্যেই হবে, আর কোথাও তা হ'তে পারবে না।

এরই মধ্যে সবল পদক্ষেপে কলকাতার প্রসিদ্ধ গুণ্ডা খেঁদার আগমন হল। ঝটপট্ বিচার হয়ে তার ফাঁসির হুকুম হল। একদিন মাত্র কম্বল মুড়ে সে প্রকোষ্ঠে শুয়ে রইল, তারপর খেঁদা-গুণ্ডার মনে যেন আর কোন খেদই রইল না। যার কাছে মানুষ হয়েছিল, পিসিমা

বা মাসিমা ফাঁসির আগে এসে ডিগ্রির কোলে বসে কাঁদাকাটি করল। খেঁদাই তাকে সান্ত্বনা দিল—কাঁদো কেন ?—আবার তোমার কোলে ফিরে আসব, নতুন মানুষ হ'য়ে।

পিসিমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল। খেঁদা লাট-বেলাটের আপিলে ভরসা রাখে নি—বলে ওটা নিরর্থক। তার জামার মধ্যে রক্তের সামান্য একটু দাগ পাওয়াতেই নাকি তার ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটির মুণ্ড কেটে ঝড়ে বাওয়া রক্ত নিয়ে ও নাকি কোনও এক রমণীকে দেখাতে গিয়েছিল—সেই হয়েছিল, ওর কাল। পুলিস-সার্জেণ্টের মুখে শুনতে পেয়েছিলাম যে পর পর পাঁচ ছয়টি হত্যার মামলা ওর বিরুদ্ধে কিন্তু প্রথম মামলাতেই ফাঁসির দণ্ড হয়ে যাবে বলে সরকার বাকীগুলোর বিচারের জন্য আর এগোয়নি।

ফাঁসির নির্ধারিত দিন এসে গেল। রাত চারটার সময় অফিসার সার্জেণ্ট ও সিপাহীরা এসে ওকে তৈরি হ'তে বলল—খেঁদা তৈরি হয়েই আছে। ফাঁসি-নামা বলে একটি শপথ জেল কর্তৃপক্ষ পড়ে শোনাল। তাতে উল্লেখ ছিল, তাদের কোনও দোষ নেই, তারা সম্রাটের আইন অনুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা কার্যকরী করছে মাত্র। খেঁদা স্নান করল, নতুন জামা কাপড় সহজভাবে পরে নিল। সবাইর সঙ্গে আলাপ করতে করতে মঞ্চের দিকে যাবার জন্য আপন ডিগ্রি হতে পা বাড়াল। খানিকটা চলবার পর আমার ডিগ্রির বরাবর এসে সে দাঁড়াল এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট পাটনী সাহেবকে অনুরোধ করল, যাবার পূর্বে সে একবার স্বদেশীবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে চায়। সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন হৃদয়বান লোক, প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। খেঁদা আমার ডিগ্রির কাছে এসে নমস্কার জানাল—আশীর্বাদ চাইল, যেন সে নতুন জীবনে আমাদের মতোই সৎকার্যে অকুণ্ঠে প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। চেয়ে রইলাম, আশীর্বাদও করলাম। কোন্ গ্রহের ফেরে অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়ে সে জীবন হারাতে

চলেছে। খেঁদা চলেছে অচল অটলভাবে—ফাঁসি-মঞ্চেব দিকে। মঞ্চের কাছে এসে সে একটি পান চাইল, সিপাহীরা তাকে পান দিল। তাবপব সবাইকে নমস্কার করে আপনা থেকেই মঞ্চে উঠে গেল—খেঁদার জীবন শেষ হল।

সিপাহী-সার্জেন্ট সব ফিবে যাবাব সময় বলে চলেছে—'বাহাদুব হ্যায', 'শেবকা হিম্মত' 'জরাহ ভি ঘাবরাযা নেহি'। ফাঁসি হ'যে যাবার পব এমন স্বচ্ছ আবহাওযা জেলে বড একটা দেখা যেত না- সমস্ত জেলখানা বিষাদের অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত অথচ সবাই খেঁদাব বিষয নিযে আলাপ করছে।

গতানুগতিক জীবন, রোগে ধবেছে। পাযেব শিকল যেন আর টানতে পাবছি না। পা' কেটে গাডি টানা মহিষের গলার চামডার মতো শক্ত হযে গেছে—নিবঞ্জনেব যেন বেশী কেটেছে বলে মনে হল। কাট্‌বার ব্যথা এখন আর নেই কিন্তু চলবাব ব্যথা বেডেছে কারণ আমাদের শরীব দুর্বল হযে পডেছে।

আবাব একদিন বিকেল বেলায বেডাবাব সময হঠাৎ রুদ্র-মূর্তিতে এক পাঠান যুবক আসামী হিসাবে দেখা দিল। এসেই আমাকে চিনতে পেবে সেলাম ঠুকে হাসিমুখে হিন্দীতে বললে "আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি, কোর্ট থেকে আপনাদের গাডি দু'খানা—মেযে ও পুরুষেব গাড়ি—অনুসবণ কবে চলতাম আবার পরেব দিন কোর্টে অনুরূপ অনুসরণ করে যেতাম। আমি হলাম লালবাজার সশস্ত্র রিজার্ভ বাহিনীর লোক। অত্যাচারী প্লেটুন জমাদার এবং আরও কয়েকটাকে গুলি করে এসেছি, বোধ করি সবগুলি মরে গেছে—এখন ফাঁসিতে যাব। আমার মনষ্কামনা পূর্ণ হয়েছে। বহুদিন প্রতিকার চেযেও ফল পাইনি, আজ তার প্রতিকার করেছি"।

সুগঠিত দেহ, ফর্শা রং, লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশী জোয়ান পাঠান যুবকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তখুনি তাকে অনভ্যস্ত জেলের নিকৃষ্টতম খাবার দিলে, সে বাটিসুদ্ধ দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, পরে ফাঁসির

প্রতীক্ষায় রাত কাটাল, যেন ভোর হতেই তার আকাঙ্ক্ষিত ফাঁসি তার শিয়রেই এসে যাবে।

তারই পাশে এল, ফাঁসির দণ্ড নিয়ে এক বিকৃত মস্তিকের এংলো-ইণ্ডিযান যুবক—বয়স আঠার হবে।

নিজের আপন বোনের স্বামীর কটূক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার টেবিলের ছুরিখানা নিয়ে তার বুকে মেরেছিল এবং অবস্থা বুঝতে পেরেই রক্তমাখা ছুরিখানা নিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে নিকটস্থ থানায় গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল। তারপর থেকে কেহই তাকে সুস্থ মস্তিষ্কে আর দেখেনি। হত্যা করবার সময় সুস্থ মস্তিষ্ক ছিল বলে হাইকোর্টের বিচারপতি কস্টেলো সাহেব নাকি ওর পরবর্তী মানসিক অবস্থার বিচার করেন নি।

পাটনী সাহেব জেলের কর্তা হলেও একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং তার উপর তাঁর আবার হৃদয়ও রয়েছে। তিনি কখনও পাগলকে ফাঁসি দেন নি। আসামীকে প্রাণ ভিক্ষার জন্য আবেদন করতে বললে সে ঠাকুরীর আবেদন করে, যীশুখৃষ্টের মতো হাত দুখানাকে চার পাঁচ ঘণ্টার মতো শূন্যে তুলে রাখে। ঘুমের বালাই নেই বা খাবারের তাগিদ নেই।

ফাঁসি দেবার দিন পড়ে গেছে। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চের পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। কিন্তু শোনা গেল কলকাতার পাদরীর দল বড়লাটের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

ফাঁসি হবার আগের দিন খবর এল—ফাঁসির দণ্ড মুকুব হয়েছে। ছেলেটি রাঁচীর পাগলা গারদে চলে গেল।

পাঠান সিপাহীটির সামরিক পেন্সনভোগী বৃদ্ধ বাপ ছেলের এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেই কলকাতার ডেপুটি পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করল। সে নাকি তাকে বলেছে—ছেলেকে পাগল 'বন্‌তে' বলো তবেই সে হয়তো বাঁচতে পারে। এই ঘটনায় পুলিসের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই তারা মামলা করতে

চাচ্ছে না। ছেলে রাজী হচ্ছে না।—শেষ পর্যন্ত বাবার চোখের জল দেখে সে রাজী হল। কিন্তু পাগল 'বন্‌বে' কি করে? তার জন্যে সে উপদেশ চাইল। তাকে বললাম,—খাবার খাবে না—যা খাবে যেন অনিচ্ছায় বা লুকিয়ে—বেশী খাবারই ছুড়ে ফেলে দিবে। কাউকে সামনে পেলেই মারতে আসবে। রাতে কখনও ঘুমিও না। যতটুকু ঘুমাবে দিনের বেলায়। দিনের বেলায় ঘুমালে রাত জাগতে তোমার অসুবিধা হবে না এবং তখন চোখ দুটা এমনিই পাগলের মতন লাল দেখাবে। মলমূত্র যেখানে সেখানে ত্যাগ করবে ইত্যাদি। এই ভাবে সে দু'চার মাস চলার পর তাকে পাগল বলে কোর্ট সিদ্ধান্ত করল, অবশ্য পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ইংগিত ছিল। তাকেও রাঁচীর পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিল।

ছাব্বিশ

একদিন একটি সার্জেণ্ট অতি সংগোপনে জানাল, ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং রাজনৈতিক উন্নত শ্রেণীভুক্তির দাবীতে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীরা অনেকদিন থেকেই অনশন শুরু করে দিয়েছে এবং তাদের দাবীর সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার এবং আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। দেশের বড় বড় নেতারা এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বাইরের জগৎ থেকে ওরা আমাদের এমনি করে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে অনশনের কোনও খবরই আমাদের নিকট তখন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনশন সম্বন্ধে কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্য নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আরও সঠিক না জেনে অনশনে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না। এরই মধ্যে সংবাদ এল যে আন্দামান থেকে পশ্চিমের দু'চার জন বন্দীকে ফিরিয়ে এনে আমাদের সারিবদ্ধ ডিগ্রিগুলোর দূরপ্রান্তে রেখেছে—সেখানে

তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। তাদের আগমনের সংবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আন্দামানে অনশন সমাপ্তি ঘটেছে—অথবা সমাপ্তির অধ্যায়ে এসেছে। এর কয়দিন পর পরিচিত একটি মুসলমান ডেপুটি-জেলার নিঃশব্দে এসে জানালেন গভর্নমেণ্টের চিঠিপত্র ও নির্দেশ হতে মনে হয় আপনাদের দু'জনকেই আলিপুর জেলে শীঘ্র স্থানান্তরিত করবে। তিনি আরও জানালেন অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৈনিক কাগজগুলো জোর লিখছে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দীরা বাইরে গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দাদার মৃত্যুর এক মর্মন্তুদ সংবাদ দিলেন। তাঁরই মুখের কাহিনী লিখছি।—

আপনি জানেন, আপনি ও আপনার বন্ধু ধীরেন বাবু (ধীরেন্দ্রকুমার মুখার্জি) যখন বক্সার কমাণ্ডেণ্ট কোটাম সাহেবকে মারবার অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলে বিচারাধীন আসামী ছিলেন, সেই সময় (১৯৩১-৩২ সাল) আমার দাদা সেখানে ডেপুটি জেলার। দাদা ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে ও গোবেচারী প্রকৃতির মানুষ। আপনারা উক্ত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য একখানা চিঠি ঢাকার প্রাচীন উকীল ও দেশ-নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখে দাদার নিকট দিলে, দাদা জেলের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সিভিল সার্জেন মিস্টার ইয়ংকে দিয়ে পাস করিয়ে চিঠিখানা ডাকে দেবার জন্য নিজের টেবিলের ওপর রেখে দেন। ইতিমধ্যে বাঙালী গোয়েন্দা অফিসারটি কোনও উপলক্ষে জেলে এসে হাজির হলে চিঠিখানা তার টেবিলের ওপর দেখতে পেয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে আপনাদের লিখিত চিঠিখানা জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট কর্তৃক পাস হয়ে ডাকে দেবার অপেক্ষায় আছে। তখুনি সে দাদার বিনা অনুমতিতে চিঠিখানা নিয়ে যায় এবং জেলের পুলিস কর্তা হড্‌সন সাহেবকে (যে ঢাকাতে দীনেশ, বাদল, বিনয় কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়েছিল) দেখিয়ে

দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সে বিপ্লবী বন্দীদের চিঠি পুলিসকে না দেখিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। এর ফলে দাদার চাকরিটি যাবার মতন হয়। জে. এম. সেনগুপ্ত মহাশয় তখন জলপাইগুড়ি জেলে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি ঘটনাটি জানতে পেরে জেলের সুপারিন্টেডেন্ট মিস্টার ইয়ংকে বুঝিয়ে দাদার চাকরিটি অনেক কষ্টে বজায় রাখতে সমর্থ হলেও দাদাকে সরাসরি ডেপুটির পদ হতে কেরানীপদে অপসারণ করা থেকে তিনি রক্ষা করতে পারেন নাই।

দাদার সংসার ছিল বড়; কেরানীর সামান্য আয়ে তাঁর সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে দাদা বরিশাল জেলে বদলী হয়ে এলেন। বাৎসরিক জেল পরিদর্শনের সময় কারাধ্যক্ষ মিস্টার অনুপ সিং-এর কাছে দাদা তার অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করলেন যেন তিনি তাঁকে ক্ষমা করে পুরাতন পদে বহাল করেন কারণ তিনি স্বল্প আয়ে তাঁর বড় সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। কারাধ্যক্ষ মিস্টার সিং দাদাকে মুখের ওপরই জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর গুরুতর অপরাধের কোনও ক্ষমা হতে পারে না এবং তাঁকে চিরকালই কেরানীর পদে থাকতে হবে। দাদা সে রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে নিজের দুঃখের অবসান করলেন।

চোখের জল ফেলে সে চলে গেল। সাম্রাজ্যবাদীর জীঘাংসার জঠরে নিরীহ আমানুল্লার প্রাণ দিতে হল। স্মৃতির পাতায় অলিখিত শহীদের তালিকায় আমানুল্লা এসে যোগ দিলেন। আমানুল্লাকে ভোলা যায় না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। আন্দামান হতে অনেক বন্ধুরাও সেখানে এসেছেন। বহুদিন পর তাদের সাথে আবার মিলন ঘটল।

কিন্তু বড় কর্তাদের নীতি বদলের সুচনা হলেও খুদে শাসনকর্তাদের আচার ব্যবহার বা মতিগতিতে তখনও কোন পরিবর্তন আসেনি।

তিন চার দিন পর জেল-সুপারিণ্টেডেণ্ট আন্নাস্বামী আয়েঙ্গার আই. এম. এস. জেল পরিদর্শনে বের হয়ে আমাদের রাজনৈতিক বন্দীদের সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলির সামনে দলবল সহ উপস্থিত হলেন। আমার অর্গল-বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর হতে আবেদন জানালাম যেন তিনি নিরঞ্জন ও আমার পা'দুখানাকে ডাণ্ডাবেড়ি থেকে মুক্ত করে দেন কারণ তখন বাংলায় ও ভারতে কোনও বিপ্লববাদী দণ্ডিত বন্দীদের পায়ে আমরা দুইজন ব্যতীত ডাণ্ডাবেড়ি আবদ্ধ ছিল না। তিনি সরাসরি অস্বীকৃতি জানালে, কারাধ্যক্ষকে লিখবার জন্য আবেদনপত্র চাইলাম কিন্তু তিনি তাও প্রত্যাখান করলেন। হাইকোর্টে টিটাগড় আপিল মামলায় আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী এড্‌ভোকেট ও ব্যারিস্টারদের নিকট চিঠি লিখবার অনুমতি চাইলে, তিনি তাও নিঃসঙ্কোচে অগ্রাহ্য করে আমার প্রকোষ্ঠ হতে দলবলসহ অন্য প্রকোষ্ঠের দিকে এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘ জেল অভিজ্ঞতায় বাংলা বা বাংলার বাইরে এযাবত কোনও ইংরেজ বা ভারতীয় অফিসারের কাছ থেকে অভিযোগ করা নিয়ে এমনতর তাচ্ছিল্যকর মনোভাব ও জবাব পাইনি। জবাবের ওপর রূঢ় জবাব পেয়েছি, জবাবের ওপর লাঠি বা গুঁতোর ভয়ও পেয়েছি কিন্তু এ রকম তুচ্ছ মনোভাবের, নীচতার পরিচয় কখনও দেখিনি। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমার মন রুখে দাঁড়াল।

তাঁকে ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনবার জন্য পিছন থেকে হেঁকে ডাক দিলাম ও আমাদের ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করবার কারণ জানতে চাইলাম। উত্তরে পেলাম ধমকানিতে রূঢ় জবাব, **"shut up"** (চুপ করো)। পারিষদ দল **"shut up"**-এর প্রতিধ্বনি তুলল। বন্দীর অভিযোগ বুঝবার বা শোনবার কোনও ইচ্ছাই এতে নেই—জেলখানায় জেলকর্তার আগমন-নির্গমনের সাথে বন্দীদের অভিযোগ শুনে যে প্রতিকারের সামান্যতম ব্যবস্থা আছে, তার প্রয়োজন যেন সুপারিণ্টেডেণ্টের মন থেকে তখন উঠে গেছে।

উপরন্তু রূঢ় জবাব দিয়ে বন্দীর হাত পা বাঁধার মতো মুখ বাঁধার প্রচেষ্টা যেন অসহনীয় মনে হল। তাই তাঁকে এবার **"shut up"** (চুপ কবো) ধমকানির জবাব দিতে শুরু করলাম। জবাব শুনে দলবল নিয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলেন—ডিগ্রি খুলে আমাকে শায়েস্তা করবার জন্য। তারপর কি-যেন-কি ভেবে বাইরে টাঙানো আমার কয়েদ-পঞ্জীখানা (**History ticket**) উলটিয়ে শাস্তি লিখবার জন্য কলম উঠালেন। তাঁকে বললাম, অনর্থক মুর্খের মতন শাস্তি দেবার বা ভয় দেখাবার কোনও মানে নেই কারণ আমার দেহে অথবা আমার কয়েদ-পঞ্জীখানাব মধ্যে শাস্তি দেবার কোনও স্থান নেই।

জেলের বড় সাহেব যখন কলম ধরেছেন তখন নিজের মর্যাদার খাতিবেও একটা শাস্তি তার লিখতেই হবে। নির্জন কারাবাসের হুকুম লিখে দলবল নিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। তখুনি সার্জেন্ট সিপাহীরা আমাকে নির্জন কারাবাসে নিয়ে গেল—আলিপুর জেল থেকে পালাবার সময়কার ডিগ্রিগুলির (চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রির) একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে।

ডাণ্ডাবেড়ি কাটাবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নির্জন কারাবাসে অনশন শুরু করে দিলাম। জেলের রাজনৈতিক বন্দী বন্ধুরা খবর পেয়ে আন্না-স্বামী আয়েঙ্গারের সাথে দেখা করলেন এবং সঠিক অবস্থা জানবার জন্য আমার সঙ্গে নির্জন কারাবাসে দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। প্রতিনিধি স্থানীয় দু'জন বন্দীকে বন্ধুবর সুনীল চ্যাটার্জি (স্টেট্‌সম্যান সম্পাদক ওয়ার্টসনকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত) ও পরেশ গুহকে (আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত) অনুমতি দিলে তাঁরা এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আন্নাস্বামী তাঁদের জানিয়েছিলেন যে আমি তাঁকে গালি দেবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি নির্জন কারাবাস থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে বন্ধুদের সঙ্গেই একত্রে রেখে দিবেন। আন্নাস্বামীই প্রথম দোষ করেছিলেন বলে সে নিজের অন্যায় ও ভুলের জন্য দোষ স্বীকার করলে, আমি তখন

নিজের দোষ স্বীকার করে নিতে পারি কিন্তু তার পূর্বে আমি দোষ স্বীকার করতে পারি না। আমার একথা বন্ধুরা স্বীকার করলেন এবং আন্নাস্বামীকে তাঁরা তা জানিয়ে দিলেন। তাঁকে জানাবার পরও অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। সেদিনমাত্র আন্দামানে জীবনপণ করে বন্ধুদের আন্দামানে অনশন করার কথা বিবেচনা করে আমি স্বেচ্ছায় অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম কারণ আমার অনশন জনিত অবস্থা দল নির্বিশেষে সেখানকার সকল রাজনৈতিক বন্ধুদেরই বিড়ম্বিত করে তুলবে যেহেতু রাজনৈতিক দাবীতে আমরা প্রত্যেকেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

শীঘ্রই আন্নাস্বামী আয়েঙ্গার নিজের চেষ্টায় আলিপুর জেল থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন—একজন বাঙালী নামী ডাঃ কর্নেল এম. দাস আই. এম. এস.। মেদিনীপুর জেলে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কয়েকদিনের ছুটিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে রেখে কোথাও কার্যোপলক্ষে গেলে মেদিনীপুর জেলের কুখ্যাত কাজী উপাধিধারী মুসলমান জেলারটি ও একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মনের নিষ্ঠুরতা মিটাবার উদ্দেশ্যে দুইজন রাজনৈতিক বিপ্লবী বন্দী মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য (দাসপুর দারোগা হত্যা মামলায় দণ্ডিত) ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীকে (বক্সা ক্যাম্পের পলাতক ও আগরতলা ডাকাতির মামলায় দণ্ডিত) বেত মারবার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত করল।

উহা কর্নেল দাসের বিদুষী পত্নী জানতে পারেন এবং স্বামীকে তখুনি তারবার্তা পাঠিয়ে দেন। তার পেয়েই কর্নেল দাস বেত মারবার পূর্বেই পৌঁছে যান এবং কাজীর "পাজী" আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন।

কর্নেল দাস আলিপুর জেলে পৌঁছে নির্জন কারাবাসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সব জানতে চাইলে তাঁকে সব খুলে বললাম।

অনুপ সিং কারাধ্যক্ষ হিসাবে প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন ডাণ্ডাবেড়ি ও তার কষ্টের কথা সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ মন নিয়ে যখন তার সমর্থনে কথা বলছিলেন তখন তাকে যেমন করে বলেছিলাম—**Escape from prison is the dream of every freedom fighters—shoot or kill they shall try it as long as their country is in bondage**—দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী বন্দীর পালান একটা নৈতিক ধর্ম—তোমরা গুলিই কর অথবা মেরেই ফেল, তাতে আমাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না কিন্তু তৎসত্ত্বেও জেলখানায় বন্দীদের মনুষ্যত্বের নিম্নতম উপযোগী খাবার-দাবার ও থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে, তেমনি কর্নেল দাসকেও বললাম যে ডাণ্ডাবেড়ি থেকে স্বাভাবিক ভাবেই পা দু'খানাকে মুক্ত করতে হবে এতে শর্ত থাকতে পারে না। কর্নেল দাস আশ্বাস দিলেন যে এক মাসের মধ্যেই তিনি ডাণ্ডাবেড়ি খুলে দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি ডাণ্ডাবেড়ির জায়গায় হালকা শিকল-বেড়ি পরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। একমাস পর তিনি ডাণ্ডাবেড়ি থেকে আমাদের পা দু'খানাকে মুক্ত করলেন।

রূঢ় জীবনের সঙ্গী হিসাবে দীর্ঘকাল তারা পা জড়িয়ে ছিল—এবার তারা বিদায় নিল। পীড়নের প্রধান আঙ্গিক-চিহ্ন দূর হল। পীড়নের অধ্যায়ের ওপর যবনিকাপাত শুরু হল। দেহের উপর দাগ কাটার মতোই মনের মধ্যেও তারা অসংখ্য ছোট বড় দাগ কেটেছে। নিকটতম বন্ধুর মতোই দূর বিদেশী আত্মীয়তার কণ্ঠ এসে আদর্শকে পূর্ণ করেছে—অগ্নির দাহিকায় কৃত্রিমতার মুখোস খুলে গেছে—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কেটে মানবিক বিচারবোধের মধ্যে আদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নের দুয়ার পার হয়ে বিশ্বের দরবারে হানা দিচ্ছে—সৈনিকের আত্মত্যাগের বাস্তব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দাবী—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন আসিবে সে দিন আসিবে।"

সাতাশ

হাইকোর্টে টিটাগড় মামলার আপিল চলেছে। বিচারপতি কস্টেলো সাহেব ট্রাইবুনালের রায়ে সন্তুষ্ট হননি। দণ্ড বাড়াবার জন্য পুনর্বিচারের কথা তুলেছেন কিন্তু গভর্নমেণ্টের আইন উপদেষ্টা নাকি বলেছেন যে ট্রাইব্যুনালের দণ্ড বাড়ান যাবে না বা পুনর্বিচারের জন্য আবার নতুন করেও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাবে না। তাই আমাদের দণ্ড অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

কয়েদ-পঞ্জীতে আমার মেয়াদের সীমারেখা, ১৯৭১ সাল। ১৯৭১ সাল পেরিয়ে রয়েছে, পশ্চিমের বিপ্লবী রাম সিং। বাংলায়ও ১৯৭১ সাল বা তার নিকট সময়ের দু'চারজন মেয়াদের দোসর আছেন—কুমিল্লার "ইটাখোলা মামলার" বিরাজ দেব, বরিশালের ফণী দাশগুপ্ত ; "আন্তঃ-প্রাদেশিকের" প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্ত ; "হিলির" প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী—সঙ্গীর অভাব নেই।

আদর্শবাদের বিচারে বিপ্লবী বন্দীদের ভিতর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। জাতীয়তাবাদের আদর্শের গণ্ডির বাইরে অনেকের মন ছুটে চলেছে মার্ক্সীয় দর্শনে, লেনিনবাদে বা স্টালিন পন্থায়। নিছক আদর্শের বিচারে জাতীয়তাবাদের গণ্ডি কেটে বের হয়ে গেল এক দল, তাদেরই টানে আবার একদল এমনি করে জাতীয়তাবাদের পুরাতন ভিত্ খসে পড়তে লাগল। দণ্ডিত বিপ্লবীদের আমূল মানসিক পরিবর্তনে পুরাতন দল ও সংহতির রূপান্তর ঘটল। জাতীয়তার স্বপ্নে-গড়া বাংলা দেশ দীর্ঘকাল ভারত রাষ্ট্রীয় গগনকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল—সুদীর্ঘকালের এই পটভূমিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল। ইংরেজ রাজশক্তি বিপ্লবীদের সবল আঘাত থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়ে নূতন পটভূমিকাতে তাদের প্রস্তুতি শুরু করল।

বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির দাবীতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তখন প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী

বিপ্লবীদের মুক্তি প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন তখন ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও হোম্-মিনিস্টার। মহাত্মা বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তি-বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তিকে সহজ করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের কাছ থেকে অহিংসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রচেষ্টা করলেন। অনেক হাঁটাহাঁটি ও ঘাঁটাঘাঁটির পর মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন—বন্দী মুক্তির প্রচেষ্টায় মহাত্মার ব্যক্তিত্ব নাজিমুদ্দিন বা অন্যান্য রাজপুরুষদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হল না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের "ডিয়ার নাজিম" প্রভুদের নিকট বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেন।

গণ আন্দোলনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির বিষয় নিয়ে সরকার "বন্দীমুক্তি পরামর্শ কমিটি" নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কেও তার সভ্যপদে মনোনীত করলেন কিন্তু হালচাল দেখে শরৎবাবু বুঝতে পারলেন যে সরকার তাঁদের সুপারিশ মেনে নেবে না তাই তিনি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কমিটির কাজ বেশী দূর এগোল না। দু'চার জনকে তাঁরা শর্তাধীনে মুক্তির সুপারিশ করলেন কিন্তু অনেকেই তা গ্রহণ করল না। শর্তাধীনে মুক্তি অগ্রাহ্য করলেন মেদিনীপুর বার্জ-হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত শান্তি সেন। বয়স অল্প বলে কমিটি তাঁকে মুক্তির সুপারিশ করেছিল কিন্তু শর্তাধীন মুক্তিনামা তিনি অম্লান বদনে অগ্রাহ্য করে অন্যান্য সবাইর মতো তাঁর দীর্ঘ দণ্ড ভোগ করে যেতে লাগলেন।

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্য থেকে মেয়ে বন্দীদের ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেল থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হল। নতুন শাসনতন্ত্র বলে গঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দণ্ডিত বৈপ্লবিক

বন্দীদের জেল থেকে মুক্তি দিল। একমাত্র রয়ে গেল বাংলার ও পাঞ্জাবের দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা। জনমতের দাবীর কাছে শেষ পর্যন্ত অকংগ্রেসী পাঞ্জাব মন্ত্রিসভাও তাদের জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। রইল শুধু বাংলার দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা—সংখ্যায় প্রায় আশী জন। তাদের দুই অংশে ভাগ করে, এক অংশকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, অপর অংশকে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে রেখে দিল। বাংলা সরকারের নীতিতে বোঝা গেল যে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি বিনা আন্দোলনে সম্ভব হবে না। অন্যান্য প্রদেশে এমনকি পাঞ্জাবে সম্ভব হলেও, বাংলার মুক্তি বিরোধী শক্তিগুলির গুরুত্ব ও সমাবেশ ছিল বেশী। বাংলার এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হল।

যুরোপীয় বণিকসভা ও লীগের সম্মিলিত বাধাকে শিথিল করবার ওপর একমাত্র দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি নির্ভর করে ভেবে আমরা বিচার করলাম যে ১৯৩৫ সালের আইনে গঠিত মন্ত্রিসভাকেও দেশবাসীর নিকট বিশ্বাস পেতে হলে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন সমাধান করতে হবে কারণ ভারতের প্রতি ব্রিটিশের আন্তরিকতার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আমরা তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যদি আমরা অনশন শুরু করে দেই তবে দেশের গণ আন্দোলনের প্রবল আঘাত ওদের সম্মিলিত বাধাকে ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে এবং যদি তা সম্ভব না হয় তবে স্বায়ত্তশাসনের আসল পরিচয়টুকু সমগ্র দেশ উপলব্ধি করবে ও বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি তাতে বৃদ্ধি পাবে। এই বিচারের পর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, ৭ই জুলাই, ১৯৩৯ সাল, মুক্তির দাবীতে আমাদের অনশন শুরু হয়ে গেল। দমদম জেলের বন্ধুরাও খবর পেয়ে অনশনে যোগ দিলেন।

অনশন মেটাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁর সেক্রেটারী শ্রীমহাদেব দেশাইকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সাথী ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। মুক্তির প্রশ্নে তাঁরাও ব্যর্থ হলেন। অনশন মেটাতে

পারলেন না। বন্দীরা যখন অনশনে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে গেল, তখন সুভাষচন্দ্র নিজে এসে অনশন স্থগিত রাখবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করলেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কর্মীপুরুষ। সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি প্রবল আন্দোলন ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই একমাত্র সম্ভব। যুক্তি যতই জোরালো হোক না কেন, জনতার দাবী মাঠ পেরিয়ে দুর্গের গায় প্রতিধ্বনি তুলুক না কেন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবাদী শক্তির নিকট একমাত্র মূল্য হল শক্তির পরিচয় তাই তিনি শক্তি সমাবেশ করবার জন্য সময় চাইলেন—নেতৃত্বের উপযুক্ত দাবী। সুভাষচন্দ্রের দাবী আমরা সবাই মেনে নিলাম—৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৯ সাল।

এই সময় আমরা বাইরে থেকে লুকিয়ে এনে নিষিদ্ধ দৈনিক কাগজ পড়তাম। সংবাদ চুরির বিদ্যায় আমরা পারদর্শী ছিলাম ও মেছুয়া-বাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শচীন কর গুপ্ত ছিলেন আমাদের পত্রিকা পড়িয়ে শোনাবার মাস্টার। গড়গড় করে তিনি পড়ে যেতেন, আমরা তাঁর চারপাশে ঘিরে বসতাম শোনবার জন্য। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম শচীন কর গুপ্তের এক একটি প্রহরীর মতো।

আঠাশ

বাইরের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—মেঘের গুরু গুরু ডাক কানে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মানী আবার নিছক জাতীয়তার বর্ম পরে সমগ্র য়ুরোপের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান সামরিক অফিসার হিট্‌লার জার্মান জাতির নায়ক। ফিল্ড মার্শাল ফন্‌ হিণ্ডেনবুর্গের সামরিক শক্তি ও কৌশলকে রূপদান করে জার্মান জাতিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসাবে দাঁড় করতে সে বদ্ধপরিকর—"ফুরার" হিটলার জার্মান জাতির মধ্যে প্রেরণা জাগিয়েছে। ফুরারের নেতৃত্বে বৃহত্তর জার্মানীর সৃষ্টির

অভিযান। ফ্যাসিস্ট মতবাদী ফুরার সাম্যবাদী রুশিয়াকে যে আঘাত হানবে—তা অনিবার্য স'ত্যি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রী ইংলণ্ড সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার নিশ্চিত ভরসা কোথায়? জার্মানীর চিরশত্রু ফরাসী দেশ তার আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভাগ—তাই ফরাসীরা জার্মান প্রান্তে "ম্যাজিনো লাইন" বানিয়ে দূর পাল্লার কামান বসিয়ে নিজের দেশ রক্ষা করছে, তার ওপারে জার্মানরাও "সিগফ্রি" লাইন বানিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। ছোট ছোট সমুদ্র পারের দেশগুলো কাহারও অঞ্চল ধরে অসহায় ভাবে সম্ভাব্য আক্রমণকারী জার্মানীর দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জার্মান বলে বলীয়ান লৌহ ও ইস্পাতের বর্ম পরে বাগ্মিতার উচ্চস্বরে ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি চমকিত করে মুসোলিনী জার্মানীর সঙ্গে সুর মিলিয়েছে—অতীত স্বপ্নের সেই রোমক সাম্রাজ্য স্থাপন করবার দূর অভিলাষ তার ইস্পাত রক্ষিত বক্ষের নীচে। অর্ধ সভ্য কিন্তু স্বাধীন এ্যাবিসিনিয়ার স্বাধীনতাটুকু ছিনিয়ে নেবার জন্য স্বাধীনতার সৈনিকদের ওপর বিষ-বাষ্প ব্যবহার করে গ্রেৎসিয়ানি ইতালিয়ান সামরিক শক্তি দেখাবার চেষ্টা করছে কিন্তু নগ্ন, অর্ধ-সভ্য এ্যাবিসিনিয়ান বাহিনী ইতালিয়ান সামরিক শক্তির আসল পরিচয়টুকু বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে—ইতালী দুর্বল।

জার্মানীর নিশ্চিত ভবিষ্যৎ আক্রমণের লক্ষ্যস্থল জেনে সোভিয়েৎ দেশ নিজের সামরিক প্রস্তুতির বিরামহীন প্রচেষ্টার সাথে জার্মানীর সামরিক পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখেছে। অদূরে সাগরের খালটুকু মাত্র পেরিয়ে রয়েছে সমুদ্রের মেখলায় ঘেরা ছোট্ট ইংলণ্ড দেশ—রচনা করেছে, আধুনিক জগতের বাণিজ্যের ও উপনিবেশের ইতিহাস পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্তে, বানিয়েছে আধুনিক গণতন্ত্র নিজের দেশের মাটির ওপর—শহীদের খুনের বিনিময়ে। তার বিরাট ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে নিজের দেশের আত্মরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। জার্মান সামরিক শক্তির তুলনায় তখনও সে দুর্বল তবুও

দেশের গণতন্ত্রের সরব প্রতিবাদ প্রধানমন্ত্রী চ্যাম্বারলেনের তোষণনীতির বিরুদ্ধে। অতলান্তিক পার হয়ে রয়েছে স্বাধীন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। সম্পদে, বৈভবে ও দক্ষতায় সে সবার শীর্ষে। গণতন্ত্রের পূজারী বলে পরিচিত জর্জ ওয়াশিংটনের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল অথবা এক-নায়কত্বের কোন দল তখনও আমেরিকানদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকার শক্তি ও সম্পদ হিটলারের ত্রাসের কারণ।

দূর প্রাচ্যে জাপান একক শক্তি। সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় চীনের ওপর দৌরাত্ম্য করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, অপেক্ষা করছে নতুন সুযোগের। মেঘ যত জমবে, জাপানের প্রাচ্যের ভূমিকা তত সহজ হবে—তাই সে সুচতুর ভাবে রাষ্ট্র গগনের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

জার্মান সামরিক শক্তির পুনরুভ্যুত্থানের সাথে সমগ্র দুনিয়ার বিভিন্ন শক্তি পরীক্ষাও অনিবার্য ভাবে এগিয়ে আসছে। পরাধীন দেশ সমূহের আন্তরিক কামনা, যেন শত্রুর হাতে তার শাসক শত্রুর পরাজয় ঘটে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য শাসকের দুশমনের সাথে মনের মিল সহজেই এসে যায়—ইংরেজের দুশমন আমাদের বন্ধু, ইংরেজের বন্ধু আমাদের দুশমন। পরাধীন জাতির মনের ছক ইতিহাস এইভাবেই রচিত করেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুদ্র পোলাণ্ডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া পূর্ব-পোলাণ্ডে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পোলাণ্ড দেশ ভাগ হয়ে গেল।

এবার বিজয়ী জার্মানী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে ফরাসী দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—বিদ্যুৎ আক্রমণে ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ফরাসী দেশ জার্মানীর পদানত হল। ইংরেজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। তবুও তারা ভারতের সঙ্গে বোঝা পড়া করল না। যুদ্ধের পবন যত এগিয়ে চলল নূতন নূতন রাষ্ট্র এসে যুদ্ধের

রঙ্গমঞ্চে আসীন হল। স্বার্থের প্রয়োজনে রক্ষণশীল গণতন্ত্রী ইংলণ্ড ও আমেরিকান রাষ্ট্র সোভিয়েৎ-এর সাথে হাত মিলাল, আর অক্ষশক্তির সঙ্গে জার্মান, ইতালী ও জাপান। ছোট ছোট দেশগুলি কেউ এদিক কেউ বা ওদিক ঘেঁসে দাঁড়াল। বুদ্ধির বিচারের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের বোঝাপড়াও ভারতে শুরু হল। পরাধীন ভারত ইংরেজ সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অক্ষ-শক্তির জয়কে নিজেদের জয়ের সমতুল্য বলে মনে করল। সোভিয়েৎ দেশের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষীয় লড়াইকে বিনা শর্তে সাহায্যের কথা স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী ভারতের মনে উৎসাহ সঞ্চয় করল না বরং জাতির মনে বৈরী ভাব সৃষ্টি হল। ভারতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আবার একদফা আঘাত শুরু হল। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীরা গ্রেফতার হলেন। একমাত্র রইল, বুদ্ধিজীবী যুদ্ধ সমর্থনকারীর দল আর ইংরেজের ঘরোয়া সমর্থকবৃন্দ যারা দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ শাসনের তলায় নিজেদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলতায় নিজ স্বার্থ গড়ে তুলেছে।

জেলের ভেতরও মাঝে মাঝে যুদ্ধের বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। "সাইরেন" বাজবার সাথে সাথে আমাদেরও ডিগ্রির ভেতর প্রবেশ করতে হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান একজন সাংবাদিককে ভারতের পশ্চিম-প্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে এল। তার নাম স্টুয়ার্ট। সে নাকি উটের পিঠে চড়ে "খাইবার গিরিবর্তের" দুর্গম পথ দিয়ে মিত্র পক্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংবাদ যোগাড় করতে যাচ্ছিল। কিছুদিন আলিপুর জেলে রাখবার পর তাকে রেখে দিল—সার্কুলার রোডের ভ্যাগ্রান্সীর আড্ডায়—সেখান থেকে তাকে নাকি শীঘ্র অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাকে এভাবে ভিখারীর আড্ডায় রাখবার জন্য সে প্রতিবাদ করল কিন্তু তার কোনও সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ভ্যাগ্রান্সীর ডাইরেক্টারের ঝোলানো টোটাভরা বন্দুকটি নিয়ে আত্মহত্যা করে নিজের ও সাংবাদিকের মর্যাদা রক্ষা করল।

সংবাদে সংক্ষিপ্ত আকারে স্টুয়ার্টের মৃত্যুর খবর দেখে ব্যথিত হলাম। সে জেলের বাইরে গিয়েও কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি (মিস্টার বি. সেন ইউ. পি. আইর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা সে প্রায়ই বলত)। সদাচারী, বিনয়ী ও নিরহঙ্কার স্টুয়ার্টের মৃত্যু লেখা ছিল, ভারতের মাটিতে—**Unsung, unheard**—কেউ জানল না, কেউ কাঁদল না, তার দেশেরই "কেসী" সাহেব তখন বাংলার লাট।

বন্ধুবর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন হল রাজ অতিথি হয়ে জেলে এসেছেন, পাশের এক তলায় একটি সেলে তিনি বন্দী। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা গোপনে চলে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে ইংরেজের সাথে যুদ্ধকালীন গণতন্ত্রের খাতিরে রফা করতে রাজী হননি বা যুদ্ধের সুযোগে বেশ কিছুটা গোছাবার লোকও ছিলেন না। তাই তিনি বন্দীশালায় "বেগার" খাটুনি খাটতে এসেছেন।

জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার পর পঞ্চ সমুদ্র ব্যাপী সমবানল পৃথিবীকে যেন ঘিরে ফেলল। এই অনলের মাঝখানে অন্তরীণাবদ্ধ সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভারত ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের আনন্দ সংবাদটুকু পরিবেশন করলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জেলখানার সমস্ত গ্লানিবোধ যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে ধুয়ে মুছে গেল। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করুক, এই বাণী উত্থিত হল অন্তর হতে—কোটি কোটি জনসাধারণের শুভেচ্ছার সঙ্গে আমাদের অন্তরের বাণীও যেন মিলিত হয় সুভাষচন্দ্রের জয়যাত্রার মঙ্গল পথে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবনতির কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ আলিপুর জেল থেকে আমাদের সবাইকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিল। কেন পাঠাল, তা জানতে না পারলেও অনুমানে মনে হল যে কলকাতা শহরকে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ মনে করছে না। ওদের

ভাবনা, যদি কলকাতা শহর শক্রর আক্রমণের ফলে হাত ছাড়া হয়ে যায় তবে বিপ্লবী বন্দীরা তো জেল থেকে সদর রাস্তায় পড়ে শক্রর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওদের ঠেঙাতে শুরু করবে।

পূর্বেই বলেছি, খাঁচার বন্দী পাখির মতো আমাদের জীবন যাত্রা শুরু হয়েছে—বিনাবিচারে রাজবন্দীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য আর নেই। অলস মন্থর দিনগুলি গল্প গুজবে, খেলাধূলায় বা পড়াশুনায় কেটে যেত। যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করা ছিল আমাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। গান্ধীজির "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সাথে সুভাষচন্দ্রের বর্মার ভিতর দিয়ে ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টা বাইরে প্রবল গণ-আন্দোলন ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে—আন্দোলনের উচ্ছ্বাস জেলের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরেও প্রবেশ করছে। সারা জেলময় প্রবল উত্তেজনা। মানশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের মতো। 'রাজার' সিংহাসন যেন তাসের খেলাঘরের মতো জনগণের দুর্জয় অগ্রগতির সামনে ধূলিসাৎ হ'তে চলেছে। **"Le Etat Moi"** **—I am the State**—আমিই রাষ্ট্র, আমিই সব, এই স্বেচ্ছাতারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার নূতন করে ভারতে জনগণের শক্তির লড়াই চলেছে। জনগণের ক্রুদ্ধ গর্জনের রোল কোথায়ও জেল ভেঙ্গে, কোথায়ও রেল উপড়িয়ে, কোথায়ও সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করে জাতীয় বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। শত শত অজানা ও অচেনা শহীদের তাজা রক্তে ভারতের মাটি সিক্ত হচ্ছে। উন্মত্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান, তার সাঙ্গপাঙ্গ ও চক্রান্তকারীর প্রতিক্রিয়াশীল দল জনগণের এই প্রবল উচ্ছ্বাস ও সুভাষচন্দ্রের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ রুখবার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমনি, যুদ্ধের অপ্রয়োজনেও তেমনি দেশের শস্যভাণ্ডার লুঠ করে, দেশ ও জাতির নৈতিক চরিত্র বিনাশ করে ভারতভূমিকে বিশেষ করে বাঙলা দেশকে শ্মশানে পরিণত করছে—শ্মশানের প্রজ্জলিত বহ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধ্ব গগনে দেখা যাচ্ছে—ওপারে মাতার ক্রন্দন, পিতার শোক, পত্নীর

বিচ্ছেদ শ্মশানকে ঘিরে যুদ্ধের বাস্তব প্রকৃতির পরিচয় দিচ্ছে।—এই মহাশ্মশানে সাম্রাজ্যবাদী কাপালিকের দল ভারতের নরমুণ্ডের ওপর সাম্রাজ্য সাধনায় রত, সঙ্গে রয়েছে শ্মশান-শৃগাল ও কুকুরের দল।

বিপর্যয়ে উন্মত্ত ইংরেজ রাজপুরুষ শাসনের অস্ত্রগুলির নির্বিচার ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে প্রতি জেলের গুটিকয়েক ইংরেজ সাহেবদের ওপর—তাদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা বুনোদের মধ্যে এখন আর পার্থক্য নেই। ঢাকা জেলে তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, নোবল সাহেব। জেলের কম্বল ফ্যাক্টরীর পুরাতন ম্যানেজার ও ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলে পরিচিত নোবল সাহেব খাস যোগ্য ইংরেজের যুদ্ধজনিত অভাবে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। ১৯৩০ সালের বক্সা ক্যাম্পের সহকারী কমাণ্ডেণ্ট ও শিক্ষানবিশ আই. সি. এস. লিলুয়ান সাহেব তখন সেখানে ঝুনো জেলা-মাজিস্ট্রেট অথবা কমিশনার।

ঢাকা জেলে বন্দী রাখবার প্রতিটি জায়গা ভর্তি হয়ে আছে। বিনা বিচারে রাজবন্দীরা জেলের একাংশ ভর্তি করেছে, দীর্ঘকালীন দণ্ডীত আমরাও করেছি জেলের অন্য এক ক্ষুদ্র অংশ—জেলের মাঝখানটায় ছড়িয়ে রয়েছে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বন্দীরা আর সাধারণ কয়েদীর দল। যুদ্ধের গতিবেগ বাড়বার সাথে সাথে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে পরিচিতদেরও জেলের মধ্যে পুরে রাখা হল। তাদের সংখ্যা কম ছিল না—ঢাকা জেলে তখন তারা চার-পাঁচশ'র মতো হবে। রাজবন্দী বন্ধুদের সংলগ্ন একটি ব্যারাকে তাদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের এখান থেকে রাজবন্দী ব্যারাকের দ্বিতল কামরাটি দেখা যেত। বিনাবিচারে বন্দী করে রাখবার তাৎপর্য বা অর্থের সঙ্গে অপরিচিত এরা শুধু জানত সীমাবদ্ধ জেলের মেয়াদ, আর মেয়াদ অন্তে খালাস হয়ে আবার কোনও অপরাধমূলক অনুষ্ঠানের জন্য জেলে

আগমন। চির-অভ্যস্ত গতিপথের পরিবর্তন তারা পছন্দ করেনি। নূতন জীবন যাত্রায় অনভ্যস্ত এই সব সাধারণ কয়েদী দাবী উঠাল যেন বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মতো তাদের সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয়—না হ'লে তারা 'অঘটন' ঘটাবে। রাজশক্তির সঙ্গে 'অঘটন' ঘটাবার ক্ষমতা বা নিজেদের উচ্চারিত কথাগুলোর তাৎপর্য তাদের অশিক্ষিত মনে বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। একথা সত্যি, বাইরের জনতার সরোষ গর্জন বা ইংরেজ রাজশক্তির বিলীয়মান চিহ্ন তাদের অবুঝ দাবীকে উৎসাহ জুগিয়েছে কিন্তু "কম্বলী"-নোবল-এর বুনো মনে এদের দাবীতে জাগাল জীঘাংসার মনোবৃত্তি—তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার দুর্দম অভিলাষ। গুটি কয়েক য়ুরোপীয়ান-এর সম্মিলিত সভায় রাত্রির বৈঠকে রূপালী আলোতে স্থির হল শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা, যেন তার প্রভাবে জেলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চিরতরে বন্ধ হ'তে পারে।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে বেড়াবার সময় মনে হল যেন আমাদের প্রাচীর-ঘেরা আঙ্গিনার প্রহরীদের মধ্যে অতি সর্তক ও সাবধানী ভাব—চঞ্চল পদক্ষেপে পায়চারি করবার সাথে তাদের দৃষ্টি রয়েছে আঙ্গিনার বাইরে। আঙ্গিনার বন্ধ দরজার গায়ে সিপাহীদের দেখবার জন্য যে একটি সরু ছিদ্রপথ রয়েছে সেখান থেকে কি যেন সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় মুহুর্মুহুঃ তারা বাইরে দৃষ্টিপাত করছে। তখনও দিনের আলো রাতের অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করে দেয়নি। বড় প্রাচীরের ওপারে সিপাহীদের ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে, সিপাহী সমাবেশের পদক্ষেপ আর বহুসংখ্যক রাইফেল জমায়েৎ করবার 'ঝনাৎ-ঝনাৎ' শব্দ। অজানা আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম প্রহরারত সিপাহীদের ব্যারাকের চাঞ্চল্যের কারণ। অতি সংক্ষেপে তারা জবাব দিল—"আভিই মালুম পড়েগা"। বলবার সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভিতরকার বড় গেট খোলবার আওয়াজ শোনা গেল এবং সিপাহীদের 'মার্চ' করে ঢোকার শব্দ ও সারিবদ্ধ ভাবে সামরিক

কায়দায় দাঁড়াবার নির্দেশ এবং সাথে সাথে গুলি করবার হুকুম— "**Fire**"। গর্জে উঠল রাইফেলগুলি স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে পরিচিত বন্দীদের ব্যারাকের দিকে। ভোরের শান্ত প্রকৃতি ঘুম থেকে আচ্‌মকা জেগে উঠল।—জাগল, আতঙ্কিত শহরবাসী। আশংকা— বন্দী ভারতের বন্ধন মুক্তি কামনার রাজনৈতিক বন্দীদের নিশ্চিত হত্যা নয়তো!

বিরামহীন গুলি চলছে, গুলির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রতিটি মানুষের জীবন গুণে গুণে নিচ্ছে, ব্যারাকের ইমারতগুলি থেকে ইট খসে খসে পড়ছে, লৌহ-গবাদের শিকগুলি গুলির প্রচণ্ড ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিযে হননকারীদের জানিয়ে দিচ্ছে—লক্ষ্য ঠিক হয়নি। গুলির বাক্সগুলির গুলি ফুরিয়ে যেতে আবার বাক্স এল—বিরামহীন অজস্র গুলি-বর্ষণ, যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। বারুদের ধোঁয়া ভরে দিল জেলের আকাশ, বারুদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বাতাস। সরকারী দুর্বৃত্তকারীর দল তাদের অভিলাষ পূরণ করছে। প্রায় এক ঘণ্টা পর গুলি করা বন্ধ হল। এবার সিপাহীরা এগিয়ে চলল, স্বভাব-দুর্বৃত্ত বন্দীদের ব্যারাকের দিকে। আবার গর্জে উঠল রাইফেলের শব্দ— মৃতের স্তূপের তলায় যারা লুকিয়ে আত্মরক্ষা করছিল এবার তাদের গুলি করছে, যারা নর্দমার ভেতর বা গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করছিল তাদেরও হত্যা করছে। তবুও যেন তাদের জীঘাংসার শেষ হল না। এবার বাঁশের শক্ত লাঠি মৃত ও অর্ধমৃতের স্তূপের উপর পড়তে শুরু করল। সবশেষে ডাক্তার এল—ইংরেজ সিভিল সার্জেন, ফিসার। শোনা যায়, তাকে দেখে দু'একজন যারা ছুটে গিয়ে তার পায়ের তলায় প্রাণ বাঁচাবার আকুল আবেদনে লুটিয়ে পড়েছিল তাদেরও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ধরণীর প্রতি শিরায় কেঁপে উঠেছিল প্রতিহিংসার দাবানল। শ্মশানের গাম্ভীর্য নিয়ে আমরা বসে ছিলাম বিমূঢ়ভাবে. তখন বেলা দশটা, জেলের অফিস থেকে আমাদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি—

গণেশচন্দ্র ঘোষ ও লেখককে জেল কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠাল। অন্যান্য সকল বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা সেখানে গেলাম—নোবল সাহেব গুলি করবার কারণ জানাবার জন্য আমাদের ডেকে ছিলেন। তিন হাত লম্বা একটি লোহার ডাণ্ডা দেখিয়ে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ঐ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে নাকি স্বভাব-দুর্বৃত্ত কয়েদীরা তাঁকে খুন করবার জন্য তেড়ে এসেছিল বলে তিনি আত্মরক্ষার্থে ও জেলে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নোবল সাহেব বলতে বলতে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদবার সময় সামনে দাঁড়ান বাঙালী জেলারকে 'কাপুরুষ' বলে গালিও দিলেন—জেলার নাকি তখন ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল। নোবল সাহেব কাঁদছে! কাঁদবারই কথা!—এতগুলি মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করবার গুরুভার তাঁর পাষণ্ডতম মনের ওপরও বোঝা হবে বই কি?—আমরা ওখানে আর বেশী সময় না থেকে চলে এলাম। সেদিন রাতের অন্ধকারে গাড়ি বোঝাই করে মৃতের স্তূপগুলি শহরের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আর যারা প্রাণে বাঁচলো, তাদের হাত পা কেটে রেখে দিল।

ঢাকা শহরবাসী জেলের সঠিক খবর তিন দিন পর্যন্ত পেতে পারেনি,—আমার বৃদ্ধা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের দুঃসংবাদের আশঙ্কায় তিন দিন অনাহারে কাটিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট হিসাবে প্রতি বৎসরই প্রজাদের সৎকার্যের পুরস্কার হিসাবে সম্মান বিতরণ করে থাকেন। ঢাকা জেলের কর্মকীর্তির পরিচয়ের স্বীকৃতি হিসাবে বাৎসরিক সম্মান বিতরণীতে নোবলের নাম প্রকাশ পেল। নোবল সাহেব উপাধি পেলেন—ও. বি. ই. (**O. B. E. order of the Britsh Empire**)। সম্রাটের খিদমতগার বাংলা গভর্নমেণ্টও অর্থের পুরস্কার নিয়ে এগিয়ে এল। যে-সব সিপাহী হত্যা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে তাদের প্রত্যিটি হত্যার জন্য মাথা পিছু এক টাকা করে বক্‌শিশ দেবার

বন্দোবস্তও হয়েছিল—কোনও কোনও সিপাহী নাকি এককভাবে কুড়িটি হত্যার জন্য কুড়ি টাকা পর্যন্ত বক্‌শিশও পেয়েছিল।

যুদ্ধের গতি ফিরতে শুরু করেছে। বর্মা পার হয়ে ইম্ফলের উপত্যকা পর্যন্ত এসেও নেতাজী সুভাষ সৈন্যসহ ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। অক্ষশক্তির অনিবার্য পরাজয়ের মুখে মিত্রশক্তির আক্রমণ দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ইটালীর ফুরার মুসোলিনী পলাতক অবস্থায় জনগণের হাতে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুর হত্যার দায়ে নিষ্ঠুরতম ভাবে প্রাণ হারাল। গোয়েবেলস্ স্ত্রী. পুত্র ও কন্যাসহ আত্মহত্যা করল। হিটলার দুর্গের ভিতর নিজেকে নিঃশেষ করল—কিভাবে তা সঠিক কেউ জানে না। জাপান নবাবিষ্কৃত এটম বোমার আক্রমণে প্রচণ্ডতম ধ্বংস-লীলার সম্মুখীন। মিত্রপক্ষের দাবী—হয় বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ নতুবা এটম বোমার ধ্বংস লীলায় সমগ্র জাতির পৃথিবী হতে বিলুপ্তি। দুটি শহরের সমগ্র অধিবাসীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মিত্রশক্তি জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের দাবী জানিয়েছে। জাপান নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের মানচিত্রে ইংরেজ রাজ-পুরুষদের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিকল্পনা এসে দেখা দিতে লাগল। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যুদ্ধের চাপে একক রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিসভা শ্রমিক দলের সঙ্গে মিলে জাতীয় যুক্ত দলের মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়েছে। শ্রমিক দল ও ব্রিটিশ জনসাধারণের চাপে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। কংগ্রেস ও মুস্‌লিম নেতৃবর্গের সাথে এ বিষয় দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়েছে। মুস্‌লিম-লীগ পরিচালিত সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ কৌশলী জিন্নার নেতৃত্বে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ব্রিটিশের আপস আলোচনার সুযোগে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে হিন্দু-ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপন করতে প্রয়াসী—খণ্ডিত ভারত স্থাপন ব্রিটিশ-বণিক ও রক্ষণশীল দলের স্বার্থের অনুকূল। সংগ্রামে অনিচ্ছুক

নরমপন্থী কংগ্রেসীরা খণ্ডিত ভারতে প্রভুত্ব পেলেই আপস করতে রাজী। এদিকে মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে জিন্না তৈরি হয়ে রয়েছে—বাংলা গভর্নমেণ্ট মুসলিম লীগের হাতে এবং সুচতুর ও কৌশলী সুরাবর্দি সেখানে প্রধানমন্ত্রী।

আমরা মুক্তির দাবীতে আবার অনশন শুরু করব, সিদ্ধান্ত করেছি। ১৯৪৬ সালের ৩১শে আগস্টের মধ্যে মুক্তির দাবীর কথা সরকারকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। কম্যুনিস্ট পার্টির একটি খবরে জানা গেল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটির অধিকাংশ সভ্যই মুক্তি দেবার পক্ষপাতী কিন্তু তিন-জনকে তাদের অনেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছে না—অনন্ত সিং, লেখক ও সীতানাথ দে।

ইতিমধ্যে জিন্না-পরিকল্পিত 'দাঙ্গা' কলকাতায় শুরু হ'য়ে গেল—অখণ্ড ভারতের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা অপরিহার্যরূপে তাঁর প্রয়োজন। এই হত্যাকাণ্ডে সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী নির্বিচারে জবাই হবার পর অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় বিকল্প হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠল। ঢাকা ও কলকাতার রাস্তাঘাট শবের স্তূপে পূর্ণ হল—অগ্নি, হত্যাকাণ্ড, লুঠ ও ধর্ষণের নারকীয় ব্যাভিচারের নিষ্ঠুরতম বাস্তব অভিনয়। পূর্ব বাংলায় হিন্দুর জবাই যেমন নির্বিচারে চলল, তেমনি ভারতের অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদেরও জবাই চলল। পূর্ব বাংলার নোয়াখালী হত্যার জবাব দিল—বিহার, বিহার-শরীফে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যেন শেষ নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত জাতির মনের ভিতর বৃহৎ ফাটল ধরাল। এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিকে দুই জাতিতে পরিণত করা সহজ হল—সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারাই জয়ী হলেন।

কলকাতায় দাঙ্গার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। জাতির বুকে গভীর ক্ষত চিহ্নগুলি সাম্প্রদায়িক ঈর্ষানল জ্বালিয়ে রেখেছে। শ্মশান-প্রেতগুলি শানিত ছুরিকা হাতে অসহায় নরনারীর ওপর অশুভ দৃষ্টিপাত নিয়ে নূতন করে দৌরাত্ম্য শুরু করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই ধ্বংস-স্তূপের উপর সুরাবর্দি মন্ত্রিসভা আমাদের মুক্তির আদেশ দিল। আবেগহীন পদক্ষেপে আমরা ঢাকা জেলের বন্দীশালার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সঙ্গে এলেন না, দিনাজপুরের নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। সরকারী মুক্তিনামাগুলি লিখবার সময় নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখ না থাকায় মুক্তি পেতে তার প্রায় দু'মাস দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাইরের ধ্বংসলীলার মাঝে দু'চার জন বন্ধু আমাদের নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, অদূরেই ছিল ক্ষুব্ধ জনতার জটলা। পিছনে রেখে এলাম তাঁদের যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে জাতির মুক্তি সাধনায় অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন ও যাঁরা বন্দীশালায় রোগে বা পীড়নে প্রাণ হারিয়েছেন।

পরিশিষ্ট

১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সনের দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার তরুণ বিপ্লবী অমিয় পালকে মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য রাঁচিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাকে নেবার জন্য কোনও আবেদন কেউ করেনি।

যাঁরা মুক্তি পেলেন মামলাসহ তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল ঃ

[ক]

১৯২৯ ১। মেছুয়াবাজার বোমার মামলা—শচীন করগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশি, মুকুল সেন, সুধাংশু দাস, নিরঞ্জন সেন, নিশাকান্ত রায় চৌধুরী।

২। বরিশাল দারোগা হত্যা মামলা—রমেশ চক্রবর্তী।

৩। ব্যাঙ্ক লুঠ মামলা—বঙ্গেশ্বর রায়, বিনয় বসু।

১৯৩০ ৪। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী লালমোহন সেন, সহায়রাম দাস, আনন্দ গুপ্ত, সুখেন্দু বিকাশ দস্তিদার, সুবোধ চৌধুরী, ফকির সেন, রণধীর দাশগুপ্ত।

৫। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলা—ডাঃ ভূপাল বসু, সুরেন্দ্র দত্তরায়, নারায়ণচন্দ্র রায় ও রোহিনী অধিকারী।

৬। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্যা মামলা—কালীপদ চক্রবর্তী।

৭। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা—কিশোরী লাল, শিব বর্মা, গয়া প্রসাদ, কমলনাথ তেওয়ারী, বিজয়কুমার সিংহ।

৮। বড়বাজার ডাকাতি ও হত্যা মামলা—সুরেশচন্দ্র দাস।

৯। সরিষা বাড়ি বোমার মামলা—অবনীরঞ্জন ঘোষ, সুনির্মল সেন, শিশির রায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী, তারকচন্দ্র কর।

১০। সালদা ডাকাতি—প্রবোধ চন্দ্র রায়, সুখেন্দ্র দাস, নুরুজ্জমান, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী।

১৯৩০-৩১ ১১। দাশপুর দারোগা হত্যা মামলা—কানন গোস্বামী, মৃগেন ভট্টাচার্য, বিনোদ বেরা, ভূতনাথ মান্না, শীতল ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র বাগ, কালাচাঁদ।

১৯৩১ ১২। ভিলিয়াস হত্যা প্রচেষ্টা মামলা—বিমল দাশগুপ্ত।

১৩। ডিপুটি পুলিস সুপার আহসান উল্লা হত্যা মামলা—হরিপদ ভট্টাচার্য।

১৪। ওয়্যার হাউস সুটিং—বিধু সেন।

১৫। আঠারবাড়ি বোমার মামলা—শচীন্দ্রনাথ হোম, গোপাল আচার্য, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী।

১৬। বরিশাল ডাক লুঠ—হীরা মোহন চক্রবর্তী, বিমলেন্দু চক্রবর্তী।

১৭। স্টিফেন্স হত্যা মামলা—শান্তি ও সুনীতি।

১৯৩২ ১৮। লিউক সুটিং মামলা—ভোলা রায় (সত্যব্রত চক্রবর্তীকে পাওয়া যায় নি ও সুধীর ভট্টাচার্যের নাম প্রকাশ পায়নি)।

১৯। চরপাড়া ডাকাতি মামলা—সত্যরঞ্জন ঘোষ, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শশিমোহন ভট্টাচার্য (বীরেন্দ্র দত্ত ডাকাতিতে নিহত হন)।

২০। গ্র্যাসাবি সুটিং মামলা—বিনয় রায়।

২১। সিঙ্গা ডাকাতি মামলা—ফণী দাশগুপ্ত, ননী দাশগুপ্ত, ভবতোষ পত্তিতুণ্ড।

২২। গভর্নর সুটিং মামলা (সেনেট হল)—শ্রীমতী বীণা দাস।

২৩। ওয়াটসন সুটিং মামলা—সুনীল চ্যাটার্জি, প্রমোদ বসু।

২৪। চর-মুগুরিয়া ডাকাতি ও হত্যা মামলা—সুরেন কর।

২৫। পালং ডাকাতি মামলা—মদন রায় চৌধুরী, রমণী গাঙ্গুলী।

২৬। কৃষ্ণনগর অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—অমৃতেন্দু মুখার্জি।

২৭। মাদারিপুর আজরিয়া ডাকাতি মামলা—যজ্ঞেশ্বর দাস, অনুকূল চ্যাটার্জি।

২৮। কুড়িগ্রাম ডাকাতি মামলা—কুমুদ মুখার্জি, রাজমোহন করগুাই, নরেন দাস।

২৯। বাজিতপুর ডাকাতি মামলা—মণীন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র লাহিড়ী, সুধাংশু লাহিড়ী, দীনেশ বণিক, শ্রীধর গোস্বামী।

১৯৩৩ ৩০। হিলি ডাকাতি মামলা—প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল সান্যাল, সরোজ বসু, আব্দুল কাদের, সত্যব্রত চক্রবর্তী, বিজয় ব্যানার্জি, আব্দুল কাদের চৌধুরী, হরিপদ বসু, রামকৃষ্ণ সরকার, কিরণচন্দ্র দে।

৩১। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট স্যুটিং মামলা—জগদানন্দ মুখার্জি, নলিনী দাস।

৩২। বার্জ হত্যা মামলা—নন্দ দুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেনগুপ্ত, সনাতন রায়।

৩৩। ইটাখোলা ডাকাতি ও হত্যা মামলা—বিরাজ দেব, বিদ্যাধর সাহা, গৌরমোহন দাস।

৩৪। উত্তরবঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলা ও ডাকাতি—হেমচন্দ্র বক্সী, জ্ঞান গুপ্ত, সতীশ বসু রায়, ষোড়শী মৈত্র, শচীন্দ্র নন্দী, আব্দুল রসিদ।

১৯৩৩-৩৬ ৩৫। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ধীরেন ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী, পরেশ গুহ, অবনী ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার পাল, সত্যেন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন তলাপাত্র, সুরেন ধর চৌধুরী, ভোলানাথ দাস, জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার, সুধীর ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ মজুমদার, হরিপদ দে, অমূল্য সেন, সীতানাথ দে, অজিতকুমার বসু, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, বিমল ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র চৌধুরী, নিরঞ্জন ঘোষাল, প্রভাতকুমার মিত্র, কিশোরী দাশগুপ্ত।

১৯৩৩-৩৪ ৩৬। কলিকাতা ডিনামাইট প্রাপ্তি মামলা—যোগেন্দ্র ব্যানার্জি।

৩৭। কলিকাতা অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—রাধাবল্লভ গোপ।

১৯৩৪ ৩৮। গভর্নর স্যুটিং মামলা (লেবং দার্জিলিঙ্)—মধু ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, সুকুমার ঘোষ।

৩৯। বার্জ হত্যার অতিরিক্ত মামলা—শান্তি সেন।

৪০। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতি মামলা—মোক্ষদা চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী, হরিহর দত্ত, গণেশচন্দ্র দে, মণীন্দ্র দে, মনমোহন সাহা, কীর্তি মজুমদার, খগেন্দ্র চৌধুরী।

৪১। বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা—প্রাণ গোপাল মুখার্জি, রজত দত্ত।

৪২। কুড়িগ্রাম অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—পূর্ণেন্দু গুহ।

৪৩। কুমিল্লা অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—ধীরেন চক্রবর্তী।

৪৪। হুগলী অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—হরিপদ চৌধুরী।

৪৫। বাঁকুড়া অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—বিমল সরকার, ভবতোষ কর্মকার।

১৯৩৫ ৪৬। বিশ্বাসঘাতক পার্টি সভ্য ও পুলিসের চর হীরালাল চক্রবর্তী হত্যা মামলা—অমূল্য রায়, পরেশ সেন।

১৯৩৫-৩৭ ৪৭। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা—প্রীতি রঞ্জন পুরকায়স্থ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী, ধীরেন্দ্র মুখার্জি, জীবন কুমার ধুপী, পারুল মুখার্জি, জগদীশ চক্রবর্তী, কার্তিক সেনাপতি, দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ ঘটক, বিভূতি ভট্টাচার্য, সুধাংশু বিমল দত্ত, হরেন্দ্র মুন্সী, শান্তি রঞ্জন সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। (মাখনলাল কর ও অজিত মজুমদার মুক্তি পাইলেও অন্য মামলায় দণ্ডিত ছিলেন।)

১৯৩৬ ৪৮। নোয়াখালি সুটিং মামলা—হিমাংশু ভৌমিক।

৪৯। দিনাজপুর ডাকাতি ও অস্ত্র প্রাপ্তির পলায়ন মামলা—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৯৩৬-৩৮ ৫০। ফরিদপুর গোয়েন্দা হত্যা মামলা—অমূল্য চৌধুরী, আশু ভরদ্বাজ।

১৯৪১ ৫১। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও পলায়নের পর ধৃত মামলা—বিনোদ দত্ত।

[খ]

যাঁরা কারাগারে পীড়নের ফলে প্রাণ দিলেন

১। ফণীভূষণ নন্দী—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা।

২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য—আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।

৩। মোহিত অধিকারী—অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা (বিহার)।

৪। রামকৃষ্ণ দে—সূর্য সেনকে আশ্রয় দেবার মামলা।

৫। মহেশচন্দ্র বড়ুয়া—বাথুয়া ডাকাতি মামলা।

[গ]

যাঁরা অনশনে প্রাণ দিলেন

১। যতীন দাস—লাহোর জেল—১৯২৯।

২। হরেন্দ্র মুন্সী—ঢাকা জেল—১৯৩৮।

৩। মহাবীর সিং—আন্দামান জেল।

৪। মোহিত মৈত্র—আন্দামান জেল—১৯৩৩।

৫। মোহন কিশোর দাস—আন্দামান জেল—১৯৩৩।

[ঘ]

যাঁর মৃত্যুর কারণ আজও জানা যায় নি

ধনেশ ভট্টাচার্য—মেদিনীপুর জেল—১৯৩৭।

[ঙ]

যিনি পুলিসের অত্যাচারে প্রাণ হারালেন

অনিল দাস—ঢাকা জেল, ১৭ই জুন, ১৯৩২।

[চ]

জাতির মুক্তি সাধনায় যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিলেন

১। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা—ভগৎ সিং, শিবরাম, রাজগুরু, শুকদেব ১৯৩১।

২। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—সূর্যসেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ১৯৩৪।

৩। কলকাতা কর্নওয়ালিস স্ট্রীট সুটিং মামলা—দীনেশ মজুমদার—১৯৩৬।

৪। ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ১৯৩৩।

৫। পার্টির বিশ্বাসঘাতক সভ্য হত্যা মামলা (বিহার)—বৈকুণ্ঠ সুকুল —১৯৩৮।

৬। ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলা (মেদিনীপুর)—ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মল জীবন ঘোষ—১৯৩২।

৭। কারাধ্যক্ষ সিম্পসন হত্যা মামলা (রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা)—দীনেশ গুপ্ত—১৯৩১।

৮। গভর্নর সুটিং মামলা (লেবং, দার্জিলিং)—ভবানী ভট্টাচার্য—১৯৩৫।

৯। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন হত্যা মামলা—কালীপদ মুখার্জী—১৯৩৩। (কালীপদকে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ফাঁসি দেওয়া

হয়েছে। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঢাকার অনুশীলন দলের কর্মী দুর্গেশ ভট্টাচার্য।)

১০। ফরিদপুর চরমুগরিয়া ডাকাতি ও হত্যা মামলা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—১৯৩২।

১১। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্যা মামলা—রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—১৯৩১।

১২। ঢাকা গ্রামরক্ষীদের গুলি ও হত্যা মামলা—মতিলাল মল্লিক—১৯৩৪।

১৩। দারোগা হত্যা মামলা—রোহিণী বড়ুয়া—১৯৩৫।

১৪। ইটাখোলা ডাকাতি ও হত্যা মামলা—অসিত ভট্টাচার্য—১৯৩৪।

[ছ]

যাঁরা জাতির মুক্তি সংগ্রামে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দিলেন

চন্দ্রশেখর আজাদ, কানাই ভট্টাচার্য, অনুজা সেন, বিনয়, বাদল, জালালাবাদ ও কালারপুরের শহীদ বৃন্দ, অপূর্ব ও নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, জ্যোতির্ময় রায়, অতুল সেন, মৃগেন দত্ত, অনাথ পাঁজা, জীবন ঘোষাল।

[জ]

যাঁরা বন্দীনিবাসে গুলিতে নিহত হয়েছেন

সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেন (হিজলী বন্দীনিবাস)—১৯৩১।